ছুটির চিঠি

ত্রিভঙ্গ রায়

প্রাপ্তিস্থান
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৯, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য চৌদ্দ আনা

মুদ্রাকর
শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ছুটির চিঠি

ঘণ্টু সণ্টু

আর

হরেনদাকে

ছুটিতে দার্জিলিঙে থাকবার সময় নন্তুকে লেখা চিঠিগুলো চুরি করে পড়বার ভারি লোভ ছিল ধণ্টুর। তার চুরি ধরা পড়ল যেদিন—সেদিন থেকে বিপদ বাড়ল আমারই। রোজই তাকে শোনাতে হত সেই সব পুরোনো চিঠির খসড়া। তারই আগ্রহে সেগুলি গোছান হয়ে 'ছুটির চিঠি'র রূপ পেল।

তাই বাংলার ঘরে ঘরে সব ধণ্টুর হাতেই তুলে দিলুম ছুটির চিঠি। তাদের ভাল লাগলেই শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থকার

নববর্ষ

১৩৪৮

এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট ও রেখাচিত্রগুলি সমস্তই গ্রন্থকারের নিজের আঁকা।

উপহার

সূচী

রূপোর মত ঝক্‌ঝক্ করছে

গোড়ার কথা

স্নেহের নন্তু,

পাহাড়ের সব খবরই দিতে হবে তোমাকে ? তবে গোড়া থেকেই শোন।

২৮ মার্চ। সকালবেলাটা ছিল ভারি সুন্দর। মুখ হাত ধুয়ে খাবার ঘরে বসেছি যে যার ডিসের সামনে। দক্ষিণের খোলা জানালাটা দিয়ে আসছে মিষ্টি মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়া আর মাঝখানের দরজা দিয়ে বারবার করে আসছেন রান্নাদি পেট-ফুলো গরম গরম কচুরি নিয়ে। খেতে

খেতে খেতে গল্প চলছে ধণ্টু মণ্টু আর লতির সংগে। মিনার তো আর ফুরসুৎ নেই, বাঁদিকের কোণ ঘেঁসে চুপটি করে বসে ও ফোলা গাল আরও ফোলাচ্ছে। পাশে বসে জেঠাই-মা পাহারা দিচ্ছেন কারুর পেট কম ভরল কিনা, কেউ খাবার ফেলে উঠে পালাচ্ছে কিনা, এই সব। মনটা এমনিতেই খুশিতে ভরপুর আর [illegible]টাও হয়ে উঠেছে বেশ জমজমাট। এমন সময় হাসি হাসি মুখে ছোট কাকিমা এসে যা পরিবেশন করলেন, সেটাই হল সবচেয়ে মধুর। ওরা তো লাফিয়ে উঠল খাবার ফেলে। সবাই মিলে দার্জিলিং যাচ্ছি। শুধু দেখা নয়, এবার একেবারে কোল বেয়ে হিমালয়ের বুকের ওপর ওঠা। তারপর আর কি। বাক্স বিছানা বাঁধাবাঁধি, জিনিস-পত্তর গোছানো, হৈ চৈ ব্যাপার। ছোট বাক্স, বড় বাক্স, মাঝারি বাক্স, পেটে লেপ-তোষক-পোরা সব সাইজের হোল্ড-অল, সুটকেস সবে মিলে দোতালার বড় ঘরটা গেল ভর্তি হয়ে। অনেক দিনের আড়ি ঘুচিয়ে হঠাৎ কখন ধণ্টু মণ্টুর ভাব হয়ে গেল। একেবারে গলাগলি হয়ে দুজনে এখানে ওখানে গিন্নী-পনা করে আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মায়েদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। উত্তরে পেলে কতকগুলো ধমক। কিন্তু সে-দিন কি আর ঐ ধমকের তোয়াক্কা রাখে ওরা? তুমিও যদি থাকতে তবে কি মজাটাই হত। হয়তো সেই বাক্স বিছানার

গোলকধাঁধার মধ্যে তুমি হারিয়েই যেতে। গরম জামা-কাপড় আর লেপ-কাঁথার বহর দেখে মিনকু তো হেসেই খুন। হিমালয়—বরফের বাড়ী, সেখানে যে খুব ঠাণ্ডা ওতো আর তা জানে না। বলে কিনা—হ্যাঁ এই চৈত্রমাস, গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, এখন আবার কিনা ঠাণ্ডা। যাই হক সে সব কিন্তু নেওয়াই হল।

সন্ধ্যে হতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে লটবহর সমেত সদল-বলে পৌঁছনো গেল শেয়ালদা স্টেশনে। দার্জিলিং মেল ছাড়বে রাত্রি সাড়ে-আটটায়। ধাকাধাকি করে কোন রকমে তো কাকা টিকিট কিনে আনলেন। যত রাজ্যের লোক, সবাই যেন আজ একসংগে দার্জিলিং যাচ্ছে। সে কি ভিড়! আগে হতেই একখানা গাড়ীতে বিছানা-পত্র পেতে বসা গেল জায়গা দখল করে। সময়মত বাঁশি বেজে উঠল। অমনি নিঃশ্বাসের সংগে হুস্ হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কোলের ভেতর আমাদের ঝাঁকানি দিয়ে বিরাট দৈত্যের মত গাড়ী-খানা ছুটে চলল শেয়ালদা ছাড়িয়ে।

দমদম, বেলঘরিয়া তারপর আরও কত ছোট বড় স্টেশন পেছনে ফেলে গাড়ী চলেছে লোহা-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে। এ-দিকে দাদামণিকে কেন্দ্র করে হাসি হল্লার তুফান তুলে জটলা পাকাচ্ছে ছোটদের দল ওপাশের সামনাসামনি দুটো বেঞ্চ

জুড়ে। ধণ্টু ঘণ্টু তো প্রতিজ্ঞা করেছে কিছুতেই ঘুমোবে না, সারারাত বসে বসে যাবে সব দেখতে দেখতে। তার ওপরে আবার গাড়ী যাবে সারাব্রিজের ওপর দিয়ে। কাজেই ঘুম বেচারাকে আজ নেহাৎ শুধুহাতেই ফিরতে হচ্ছে।

রাত তখন প্রায় সাড়ে-বারোটা। ওপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে কালো কালো জমাটবাঁধা থম্‌থমে আঁধার। সেই আঁধারের কোলে মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে ঘুমন্ত গ্রামগুলি রেললাইনের ত্বপাশে। ধণ্টুদের প্রতিজ্ঞার বাধা ঠেলে ঘুমপরীরা কখন এসে চোখে নিদ্‌কাঠি ছুঁইয়ে ওদের নিয়ে চলে গেছে কোন্ স্বপনপুরীর সিংদরজায়। কলরব থামিয়ে কেউ কারুর ঘাড়ে পা তুলে দিয়ে, কেউ বা বেঞ্চে বাতুড়-ঝোলা হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একমনে দেখছি সীমাহীন অন্ধকার সারা পৃথিবী-টাকে কাজলমাখা করে দিয়েছে, এমন সময়ে গাড়ী উঠল সারাব্রিজের ওপর।

সত্যিই সারাব্রিজ খুব প্রকাণ্ড, বড় বড় মোটা মোটা থামের ওপর দাঁড়িয়ে পদ্মার একূলে ওকূলে ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিয়েছে। রাতের আঁধারেও রূপোর পালিশ পাতের মত ঝক্‌মক্ করছে পদ্মার জল ত্বদিকে যতদূর দেখা যায়।

সত্যি কথা বলতে কি ভাই, তারপরে আমি ঘুমিয়ে

পড়েছি। তা বলে ভেব না যেন খুবই ঘুমিয়েছি। গাড়ীর ঝাঁকানিতে কখনো বা যায় মাথাটা ঠুকে, নয়তো দেখি এক-খানা পা এসে পড়ে ঘাড়ের ওপর। মাথার দিকে লতি শুয়েছিল যে।

তখন সবে পূবসাগরে স্নান সেরে রক্তরাঙা চেলি পরে দু-হাতে সোনা ছড়াতে ছড়াতে অরুণ-রথে সূয্যিমামা উদয় হচ্ছেন পূব-আকাশের কোলে, এমন সময় গাড়ী থামল জলপাইগুড়ি স্টেশনে। স্টেশনটি বেশ বড়সড় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হঠাৎ জেগে উঠে বুকের কাছে তুহাত জড়ো করে ঠোঁটে ঠোঁটে কাঁপন তুলে মিনকু তো গোলমাল বাধিয়ে তুললে—তার এক্ষুনি গরম জামা চাই। হিমালয়ের ঠাণ্ডার আভাস পাওয়া গেল এইখানেই। গায়ে তো সব গরম জামা চড়িয়ে বসলুম। হাসছ কেন? চৈত্রমাস হলেও যে এখানে শীত। তারপরে যা হল তা তো বুঝতেই পারছ। মুখ হাত ধুয়ে সকলে মিলে গোলযোগ করতে করতে জলযোগ পর্বটা সাংগ করা গেল।

তারপর প্লাটফর্মে নেমে একটু বেড়াব অমনি উত্তরদিকে আবছা আলোয় দেখা গেল হিমালয়ের বিরাট দেহ। ফেনার মুকুট-পরা সমুদ্রের ঢেউএর মত মেঘ-জড়ানো ঘন নীল চূড়া-গুলির পেছনে ধূসর রঙের চূড়াগুলি পরপর উঠতে উঠতে

আবছা হয়ে মিলিয়ে গেছে আকাশের বুকে। দেখেই তো চোখ জুড়িয়ে গেল, মন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, কতক্ষণে যে ঐ অচেনার সংগে পরিচয় ঘটবে।

শিলিগুড়ি স্টেশনে নামলুম তখন সাতটা। এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। এই রেলপথেই ছোট্ট গাড়ীতে চড়ে উঠতে হবে হিমালয়ে। গাড়ীর কামরা-গুলো এত ছোট যেন এক একখানা পাল্কি। সামনাসামনি দুখানা করে বেঞ্চ পাতা, তাতে বসতে পারে ছজন থেকে আটজন লোক। এইরকম একখানা গাড়ীতে তো উঠে বসা গেল। জিনিসপত্র কিন্তু নেবার যো নেই এতে—সে সব আসবে লাগেজে।

ভাবছ বুঝি এইবারে আমরা পাহাড়ে উঠলুম? শিলিগুড়ি থেকেই তো আর রেললাইন পাহাড়ে ওঠে নি। এখনও গাড়ী চলেছে বাংলার সেই সমতল ভূমির ওপর দিয়ে। দুপাশে সেইরকমই শস্যশ্যামলা বাংলার মাঠ, মাঝে মাঝে গাছের সারি। ছোট হলে কি হয়, গাড়ী কিন্তু তীরের মত ছুটে চলে। মিনিট তিনচার পরেই পূবদিকে দেখা গেল মস্ত বড় প্রকাণ্ড এক মাঠ, তার মাঝ দিয়ে চলে গেছে আর একটা ছোট রেল-পথ। ১৯০৪ খৃস্টাব্দের তিব্বত অভিযানের প্রধান আড্ডা হয়েছিল ঐ মাঠে। আর ঐ যে রেললাইনটা না? ওটা

গেছে কালিমপঙ অবধি। কালিমপঙ দার্জিলিং জেলার একটি বড় শহর।

শিলিগুড়ি থেকে চার মাইল দূরে পঞ্চানই জংশন। এখানটা কেন জংশন হল জান তো? এখান থেকে যে পশ্চিমে কিষেণগঞ্জ লাইন বেরিয়েছে।

দার্জিলিং জেলার দক্ষিণের এই অংশটা, যেখানে হিমালয় সমতলের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানটাকে বলে তরাই অঞ্চল। উত্তরদিকে একটু একটু করে উঁচু হয়ে গেলেও এখানটা প্রায় সমতল, শুধু মাঝে মাঝে এখানে সেখানে পাথর বালির স্তূপ আর ছোট বড় জংগল। তরাইকে এখানকার লোকেরা বলে মোরঙ। এর মত অস্বাস্থ্যকর জায়গা বোধ হয় আর নেই। এখানকার হাওয়ার সংগে যেন বিষ-বাতাস জড়িয়ে আছে। ম্যালেরিয়ার আদিম বাসস্থান হচ্ছে এই তরাই অঞ্চল। যত সব ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট ঝরণা হিমালয়ের কোল বেয়ে নেমে এসে এখানে জমা হয়, আর তাদের সংগে বয়ে-আনা গাছপাতা ডালপালাগুলো পচতে থাকে। তারপর ঐ পচা জলে হয় বিষাক্ত মশার সৃষ্টি। ঐ-সব মশা একবার কামড়ালে কি আর রক্ষা আছে? ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়ে তবে ছাড়বে। ম্যালেরিয়াকে এখানকার লোকেরা বলে আবাল। এরকম অস্বাস্থ্যকর জায়গায় কি

আর অন্য লোকে বাস করতে পারে? এখানে বাস করে শুধু ছোটনাগপুরী সাঁওতাল ওঁরাও মেচ ধীমাল এইসব জাত। এরা যেন কেমন করে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে এখানকার বিষাক্ত আবহাওয়ার সংগে। তারাই এখানকার বাসিন্দা। আগে এরা জংগল পুড়িয়ে জমি পরিষ্কার করে চাষ আবাদ করত। এখন চাষ আবাদও করে, আবার চা-বাগানে কুলির কাজও করে।

শিলিগুড়ি থেকে এখান পর্যন্ত লাইনের তুপাশে সবুজ রঙে ভরা চা-বাগানগুলো ভারি সুন্দর। আচ্ছা, চা-গাছ কেমন বল দেখি? যাক, আর বলে কাজ নেই, আমিই বলে দি শোন। তোমার ফুলবাগিচার সামনে যে বেলফুলের গাছগুলো আছে না, চা-গাছ দেখতে অনেকটা ঐরকম গুল্ম ধরণের। তবে এর পাতাগুলো একটু লম্বা আর অল্প খাঁজ-কাটা। চাগাছের কচি কচি পাতা তুলে শুকিয়ে খাবার উপযুক্ত করা হয়। এখানে অনেকগুলো চায়ের কারখানা আছে। চা-বাগানের মালিক বেশির ভাগই ইউরোপের লোক, তবে ভারতের লোকও যে একেবারেই নেই তা নয়।

দার্জিলিং জেলায় চা-বাগান আছে প্রায় ১৮৪টি আর এখানে চাএর চাষ হয় প্রায় ১৪ লক্ষ বিঘা জমিতে। হাজার

হাজার কুলি এই সব চা-বাগানে কাজ করে খাওয়া-পরা চালায়। এখানকার মত এত বেশি আর এমন ভাল চা

একটু লম্বা আর অল্প খাঁজ-কাটা

ভারতের আর কোথাও জন্মায় না। ঐ সমস্ত চা কত দেশ-বিদেশে চালান করা হয়। একবার এখানে চা হয়েছিল প্রায় ১৩২২৭০ মণ। সে হচ্ছে আটচল্লিশ বছর আগেকার কথা ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে। তা হলে এখন আবার আরও কত বেশি হচ্ছে তা তো বুঝতেই পারছ। চা-ই হল এখানকার প্রধান বাণিজ্য আর এই বাণিজ্যের গরম গরম প্রসাদে তোমাদের সকালবেলাটা কি আরামেই কাটে বল দেখি?

এহেন চায়ের প্রথম চাষ এখানে কেমন করে হল শোন।

সে প্রায় আশি বছর আগেকার কথা। ক্যাম্বেল সাহেব ছিলেন দার্জিলিঙের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। দার্জিলিঙের মাটি আর আবহাওয়া দেখে তিনি ভাবলেন এখানটা হয়তো চা-গাছের বেশ উপযোগী হতে পারে, দেখলে হয় কিছু চা আবাদ করে। ভাববার সংগে সংগেই কাজও আরম্ভ।

পাহাড়ের গা কেটে ছোট ছোট ক্ষেত তৈরি করে প্রথম চায়ের আবাদ হল ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে। তারপর আশার অতীত ফল দেওয়াতে চায়ের নিজস্ব আস্তানাই হয়ে গেল দার্জিলিঙে। এর বছর ছয়েক পরে আবার এখানে হল সিংকোনার চাষ। সিংকোনা কি জান তো? যার ছাল হতে ম্যালেরিয়ার যম কুইনিন তৈরি হয়।

সিংকোনার ব্যবসাতেও এখান হতে গভর্নমেণ্টের লাভ হয় প্রায় লাখ টাকার ওপর।

এইতো গেল চা সিংকোনার আদিপর্ব, এখন আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যাক চল।

পঞ্চানই জংশন ছাড়িয়ে তিন মাইল পরে শুকনা স্টেশন। এখানটা কত উঁচু শুনবে? ৫৩৩ ফুট। তবে এ উঁচুটা খুব ধীরে ধীরে হয়েছে বলে কিছু বোঝা যায় না। এইবার কিন্তু

গাড়ী উঠবে একেবারে পাহাড়ের ওপর। এতক্ষণে উঠছি সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। হিমালয়ের কোলে। দুধারে বড় বড় শালগাছ পাহাড়ের চূড়াগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ-পানে মাথা উঁচু করে সারি সারি দাঁড়িয়ে গহন বনের সৃষ্টি করেছে। ভেতরে তার সূর্যের আলোটুকুও ঢুকতে পারে না। উজ্জ্বল সবুজ রঙের বড় বড় পাতাওয়ালা কত রকমের পরগাছা কোন কোন গাছকে আগাগোড়া মুড়ে ফেলে ঘোমটাপরা নতুন বউটি সাজিয়ে দিয়েছে। আবার কোন কোন গাছে জড়িয়ে দোল খাচ্ছে কত রকমের লতা। থরে থরে হরেক রঙের ফুলের থোপনা ঝুলছে ঐসব লতায়। কোন কোনটার ফুল ধবধবে শাদা, কোনটার রং বেগুনী, কোনটার বা নীল-কান্ত মণির মত নীল, আবার কোন কোনটার আগুনের ফুলকির মত টকটকে লাল। এত মনোরম আর ভীষণ এ বন।

গাড়ী ছুটে চলেছে এই সব নিবিড় বনের ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে নীল রঙের চা-বাগানগুলো। কখনো বা গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে দেখা যাচ্ছে বাংলার দুর্বা-শ্যামল সমতল ভূমি, আবার লুকিয়ে পড়ছে নিমেষের মধ্যে। ছোট গাড়ীর ছোট জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যাচ্ছি এই সব বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে। খানিক পরে হঠাৎ দেখি পূব-

দিকে হীরার মত ঝক্‌ঝক্ করছে তিস্তা নদী, আর তার ছুপাশে দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে ঘন সবুজ মাঠ। সে যে কি চমৎকার। অমনি মনে পড়ে গেল তোমার সুর করে পড়া কবিতার সেই ছুটো লাইন, সেই যে—

"যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার,
ঝলমল ভানু-করে করে অনিবার।"

দেখতে দেখতে এদৃশ্য চকিতে লুকিয়ে গেল। আবার সেই গভীর অরণ্য। কোথাও কোথাও পাথরের বাধা ঠেলে ছোট ছোট ঝরণাগুলো আপন মনে গান গাইতে গাইতে চলেছে কোন্ দিকে কে জানে। তাদের গানের ঝিরিঝিরি ঝুরুঝুরু সুর গাড়ীর আওয়াজ ছাপিয়ে কানে এসে পৌঁছয় অনেক দূর থেকে। রঙ্‌টঙ্‌ আর চুণাভাটি ছাড়িয়ে গাড়ী চলল হাঁপাতে হাঁপাতে। এখন আমরা ২২০৪ ফুট উঁচুতে।

সত্যি ভাই, পাহাড়ের ওপর এমন রেলপথ বোধ হয় আর কোথাও নেই। কি কৌশলেই যে এই লাইনটা তৈরি হয়েছে। এতে খরচও হয়েছে অনেক। রেললাইনের ধারে ধারে এঁকে বেঁকে পাহাড়ের মাথা অবধি উঠেছে একটা চওড়া রাস্তা। সেটার নাম ওল্ডকার্ট রোড। রেল তৈরির আগে যাওয়া আসার সুবিধার জন্যে সমতল পর্যন্ত পাহাড় কেটে ঐ রাস্তাটা তৈরি করে দিয়েছিলেন মেজর বয়েড সাহেব। তারপর রেল পাতা

আরম্ভ হল ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে, আর হাজার হাজার কুলি রোজ রোজ খেটে তিন বছরে তা শেষ করতে পারলে। এই রেল-পথ তৈরি করতে প্রতি মাইলে খরচ পড়ল তিন হাজার পাউণ্ড, আর মেজর বয়েডের ওল্ডকার্ট রোড তৈরি করতে পড়েছিল মাইলে ছ হাজার পাউণ্ড।

এমন যে রেলপথ তারই ওপর দিয়ে শিলিগুড়ি থেকে সাড়ে-এগারো মাইল আসতেই দেখতে পেলুম রেললাইনের একটা মজার বাঁক। এই বাঁকটাকে বলে লুপ। খুঁটিতে যেমন সাপ ওঠে লাইনটাও তেমনি উঠেছে এঁকে বেঁকে প্যাঁচে প্যাঁচে পাহাড়ের গা বেয়ে। কোথাও আবার উঠেছে ঠিক যেন 'দ'এর মত। এমনি করে লাইন কোথাও বা চড়েছে পাহাড়ের ঘাড়ে, কোথাও বা পিঠে আবার কোথাও বা একে-বারে মাথার ওপর। উঠতে উঠতে পাহাড়ের পাঁচিলের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বহুদূরবিস্তৃত বাংলার সমতল ভূমি, ছবির মতই ছোট্ট আর তার চেয়েও অনেক সুন্দর।

৯টার সময় গাড়ী এল তিনধেরিয়া স্টেশনে। এখানটা হচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে ২০ মাইল দূরে। ২৮২২ ফুট উঁচুতে এটি বেশ বড় স্টেশন। এখানে গাড়ী একটু বেশিক্ষণ থামল বলে সোরাবজীর দোকানে চাএর পর্বটা সারা হল। তারপর

গাড়ী ছাড়লে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসলুম যে যার জায়গায়। হ্যাঁ, আবহাওয়ার কথাটা বলা হয় নি, না ? আমরা যতই উঠছি শীতও যাচ্ছে ততই বেড়ে। অমনি সংগে সংগে আমাদের ঘাড়ে চড়ছে র‍্যাপার কম্বলের বোঝা।

তিনধেরিয়ার পর থেকেই আবার পাহাড়ের চেহারা গেছে বদলে। দুধারে সেই গভীর অরণ্যের বদলে ছোট ছোট গাছের জংগল আর পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে চাএর আবাদ। এই জংগলে পাওয়া যায় পেন্সিল দেশলাই এই সব তৈরি করবার জন্যে নরম কাঠ। পাহাড়ের বাসিন্দাদের সংগে প্রথম দেখা হল এইখানেই। এদের বেশির ভাগই নেপালী ভুটিয়া নয়তো লেপচা। বেঁটে বেঁটে মোটাসোটা স্বাস্থ্যভরা নিটোল শরীর এদের। নেপালীরা একটু তামাটে, ভুটিয়া আর লেপচাদের বেশির ভাগই বেশ সুন্দর। গোলগাল মুখে চ্যাপটা নাক, ছোট ছোট চোখ, আর টুকটুকে ঠোঁট-গুলি দেখতে বেশ লাগে। গালের হাড় একটু উঁচু হলেও গাল আর ঠোঁট দিয়ে গোলাপী আভা ফেটে বেরুচ্ছে। রঙিন ঠোঁট দুটিতে জড়িয়ে আছে অফুরন্ত মিষ্টি হাসি। এদের সাজসজ্জাও একেবারে অন্য ধরণের। পুরুষেরা পরে ঢিলে পায়জামা আর শার্টের ওপর মোটা কোট, মাথায় টুপি তো থাকেই। মেয়েদের পোশাক বেশ মজার। তারা পরে

তিনখানা কাপড়, তা ছাড়া জামা তো আছেই। তিনখানা কাপড় পরা শুনে হাসছ বুঝি? কেমন করে পরে শোন। প্রথমে একখানা কাপড় পরে হিন্দুস্থানীদের মত সামনে কোঁচা দিয়ে। সেটা আর গায়ে দেয় না। দেখতে অনেকটা ঘাগরার মত বেশ সুন্দর হয়। তারপর গায়ে পুরোহাতা জামার ওপর বুকে জড়ানো থাকে একখানা ছোট্ট কাপড়। আর একখানা থাকে মাথায় ওড়নার মত। সেটা প্রায় আলোয়ান বা শালের ধরণের। দেখতে বড় মন্দ লাগে না। তবে এদের নাকের কানের আর গলার গয়না যা বড় বড়। পাহাড়ের সব

পরে তিনখানা কাপড়

স্টেশনেই কুলির কাজ করে বেশির ভাগ মেয়েরা। এই সব কুলি-মজুরদের অনেকে এসেছে আবার তিব্বত থেকে। নোংরা দুর্গন্ধ পোশাক-পরা তিব্বতী পুরুষদের মাথায়

একটা বিনুনি ঝুলচে পিঠের ওপর, আর মেয়ে-দের মাথায় দুপাশে দুটো বিনুনি বাঁধা। মেয়েদের মধ্যে অনেকে দেখতে মন্দ নয়। সবুজের আভা-দেয়া নীল পাথরের কাজ-করা সোনা রূপোর বড় বড় গয়না-পরা তিব্বতী কুলি-মেয়েরা গাড়ীর দরজায় ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে বোঝা বইবার জন্যে। বড় মেয়ে-দের গলায় লাল সুতোয় গাঁথা টাকার মালা, কারুর কারুর গলায় আবার আধুলির মালা, আর ছোট্ট ছোট্ট গোদা গোদা খোকা খুকুদের গলায় সিকি নয়তো দুআনির মালা। মাথার সঙ্গে ফিতে দিয়ে বাঁধা পিঠে

অক্লেশে ওঠা নামা করছে

ঝোলানো লম্বা ঝুড়িতে ভারি ভারি বোঝাই নিয়ে এই সব কুলি-মেয়েরা অক্লেশে পাহাড়ের ওপর ওঠা নামা করছে।

সত্যি ভাই, এতক্ষণে মনে হচ্ছে যেন কোন নতুন দেশে এসে পড়েছি। এখানকার লোকজন, ঘরবাড়ী, জমিজায়গা কিছুই যেন আর বাংলার সংগে মেলে না। তেমনি শাড়ি-পরা মেয়ে, কোঁচানো ধুতিপরা পুরুষ, সেই সবুজ অবারিত মাঠ, কিছুই আর চোখে পড়ে না। বাংলার ভেতরে হয়েও এ যেন এক নতুন দেশ। তোমার দেশের মত এমন রকমারিই বা আর কোথায় আছে বল তো?

কত নতুন নতুন সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আরও হাজার-খানেক ফুট উঁচুতে এলুম গয়াবাড়ী স্টেশনে। গয়াবাড়ী ছাড়িয়ে গাড়ী সবে মাইলখানেক পথ চলেছে অমনি কিসের ঝপ্ ঝপ্ আওয়াজ কানে এল। দেখতে দেখতে দেখি প্রকাণ্ড এক ঝরণা ভীষণ রবে লাফাতে লাফাতে, নুড়িগুলোর মাথায় মাথায় ঠোকর লাগিয়ে পাথরের দেয়াল ভেঙে চুরে ছুটে চলেছে সমতলের বুকে। নাম তার পাগলা ঝোরা। নাম শুনেই বুঝতে পারছ কি রকমের ঝরণা এটা। আগে এর কলেবর ছিল আরও ভীষণ। বর্ষার সময় পাগলের মতই রেললাইন ভেঙে চুরমার করে দিত বলে একে তিনটে ধারায় ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তাই আগের চেয়ে এর চেহারাও গেছে ছোট হয়ে, আর জোরও গেছে কমে।

২

এরপর ৪১২০ ফুট উঁচুতে মহানদী স্টেশন। মহানদী ছাড়িয়ে কার্সিয়াং। এখানটা ৪৮৬৪ ফুট উঁচু আর শিলিগুড়ি থেকে ৩২ মাইল দূর। কার্সিয়াং দার্জিলিং জেলার একটা বড় শহর বলে এখানকার স্টেশনটিও বেশ বড়। অনেকক্ষণ পরে এখানে আবার বাঙালীর মুখ দেখতে পেয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল। দার্জিলিঙের চেয়ে শীত কম হলেও কার্সিয়াং বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। আবার বাড়ীভাড়াও কম বলে অনেক বাঙালী এখানে চেঞ্জে এসেছেন। তা ছাড়া স্টেশনের ওপরেই রয়েছে বাঙালীর চা খাবার এইসবের দোকান। গাড়ী এখানে দাঁড়াল প্রায় একঘণ্টা। কাজেই প্লাটফর্মে নেমে চারদিকের দৃশ্যটা একবার দেখে নেওয়া গেল। প্রকৃতির যে রূপ এখান থেকে দেখলুম তা কক্ষনো ভোলবার নয়। চারদিকেই পাহাড়ের পর পাহাড়। দূরের গুলি ঘননীল আর কাছের গুলি ঝকৃঝকে সবুজ চা-গাছে মোড়া। দক্ষিণদিকে পাহাড়ের ঢেউ ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেছে সমতলের বুকে। তারপরেই বাংলার মাঠ দূরে দূরে অনেক দূরে গিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। বড় বড় গাছগুলো যেন যাদুমন্ত্রে হয়ে গেছে ছোট ছোট ঘাসের চাপড়া আর বড় বড় নদীগুলো বাঁকাচোরা রূপোর তারের মত চিকৃচিক্ করছে সবুজ মাঠের মাঝে মাঝে। এই সমস্তটার ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি

করেছে ৬ওরদি কর পাহাড়গুলো আকাশ-ছোঁয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। এত উঁচু হতে সমতলের দৃশ্য যে কি মনোরম। পাকা হাতের আঁকা খুব সুন্দর ছবিও হার মেনে যায় এর কাছে।

কার্সিয়াং ছেড়ে গাড়ী চলল দুপাশে দোকানপাট হাট বাজারের মাঝ দিয়ে। এর পরের স্টেশন টুঙ্ ৫৬৫৬ ফুট উঁচু, তারপরেই ৬৫৪২ ফুট উঁচুতে সোনাদা। এখান থেকে আবার দুপাশে চা-বাগান ছাড়া কপি মটরশুঁটির ক্ষেতও রয়েছে। চৈত্র থেকে পূজো পর্যন্ত যে সব কপি আর মটর-শুঁটি খাও না, সেগুলো সব যায় এখান থেকে। ও সময় তো আর তোমাদের ওখানে এসব জন্মায় না। কপি-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও বা গায়ে কম্বল জড়িয়ে লাঠি হাতে পাহাড়ী ছেলেরা গরু ভেড়ার পাল চরাতে এসে গাড়ীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। গরুগুলোও ছাড়া পেয়ে চরতে চরতে চলে গেছে অনেক দূরে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন শাদা শাদা ফুল থরে থরে ফুটে রয়েছে সবুজ পাহাড়ের কোলে।

দেখতে দেখতে এসে পড়লুম ঘুম। ভাবছ বুঝি খুব ঘুমিয়ে পড়লুম? তা নয় ঘুম হচ্ছে এই লাইনের সবচেয়ে উঁচু স্টেশন। এখানটা ৭৪০৪ ফুট উঁচু। ঘুম যেন সত্যিই

ঘুমিয়ে আছে, সব সময়ে কুয়াসায় ঢাকা, কচিৎ সূয্যিমামার দর্শন মেলে, তাই এখানকার বুড়ীদের বড়িও শুকোয় না। কুয়াসাও আবার এত ঘন যে ছ হাত দূরের মানুষও দেখা যায় না।

ভাবছ বুঝি বেশ আরামেই আসছি রেলগাড়ী চড়ে? মোটেই তা নয়। জাহাজে চড়লে যেমন অনেকের সমুদ্র-পীড়া হয়, এ লাইনের ঝাঁকানি খেতে খেতে অনেকের অবস্থাও হয়ে পড়ে তেমনি সঙ্গীন। কতজন যে গাড়ীর মধ্যে বমি করতে আরম্ভ করেছে। খুব মোটা প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক তো গাড়ীর ভেতর কুমড়ো-গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করেছেন।

ঘুম পর্যন্ত আসতে গাড়ী আবার এক এক সময় এমন রাস্তা দিয়ে আসে যে লাইনের ঠিক পাশেই একেবারে হাজার হাজার ফুট নীচু। সেদিকে চাইলে মাথা যায় ঘুরে। মনে হয় গেল বুঝি গাড়ীখানা উল্টে। আবার কোথাও কোথাও চলেছে প্রকাণ্ড দুই পাহাড়ের পাঁচিলের মাঝে আলো আঁধারি সরু গলির ভিতর দিয়ে।

ঘুমের পরেই লাইন নামতে আরম্ভ করেছে। এতক্ষণ আমরা উঠেছি হিমালয়ের দক্ষিণ গা বেয়ে আর এখন নেমে পড়ছি উত্তর গায়ে। বাংলার দৃশ্য আর দেখবার উপায়

নেই। পাহাড়ের আড়ালে বাংলা মা এবার একেবারে গা ঢাকা দিয়েছেন। এবার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে চারদিকেই দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের বিচিত্র দৃশ্য। সেই সমুদ্রের ঢেউয়ের মত শৃংগের পর শৃংগ আকাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে, আর তাদের কোলে মেঘ কুয়াসার অবিরাম লুকোচুরি খেলা।

তখন সাড়ে-বারোটা—গাড়ী থেকে দেখতে পেলুম দার্জিলিং শহর। কি সুন্দর—যদি দেখতে। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে বাড়ী, সারা শহরটা তৈরি হয়েছে যেন একতালা দোতালা করে। হরেক রকমের বড় বড় চিরসবুজ ঝাউগাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে—আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে শাদা শাদা বাড়ীর লাল রঙের ছাদগুলি কি সুন্দরই যে দেখাচ্ছে।

এতক্ষণে গাড়ী থামল খাস দার্জিলিং স্টেশনে। প্লাটফর্মে গাড়ী ঢুকেছে কি না ঢুকেছে অমনি চারদিক থেকে ঘিরে এল কুলি, রিক্সাওয়ালা আর গাড়োয়ানের দল। সে তাদের কি হুড়োহুড়ি আর চীৎকার! কানে তো তালা লাগবার জোগাড়। শুধু এ বাঙালী বাবু আর ছে শব্দ দুটো ছাড়া আর কোন কথাই তাদের বুঝতে পারলুম না। এখনো এদের ভাষার সংগে আমাদের পরিচয় হয় নি কি না তাই। যাই

হক, এই গোলমালের ভেতরেই সবাই তো নেমে পড়লুম গাড়ী থেকে। স্টেশনের একটু ওপরেই উডল্যাণ্ড মিত্র বোর্ডিং। আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল এখানেই উঠব। রিক্সা চড়ে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া হল পুরো একঘণ্টা। নেব না? কীরকম ঘুরপাক খেতে হয়েছে বল দেখি তারপর হাতমুখ ধুয়ে সেরে ফেলা গেল ভোজনপর্বটা।

বল তো হাতমুখ ধুয়েছি কি জলে—ঠাণ্ডা জলে? তার যো-টি নেই এখানে। খাওয়া, হাতধোয়া সব গরম জলে। যা শীত। দেশে মাঘ মাসেও এমন শীত হয় না। গরমের সময় কলকাতার তাপ হয় ১০৫ থেকে ১০৭ ডিগ্রি পর্যন্ত— আর শীতকালে নামে ৬০।৬৫ ডিগ্রি। আর এখানে? খুব গরমে এখানে হয় ৬৫ ডিগ্রি আর শীতের সময় নামে ৩০ ডিগ্রি। তাই কলকাতার মত গরম জায়গা থেকে এসে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগালে অসুখের ভয় আছে। কাজেই গরম জল ব্যবহার করাই সবচেয়ে নিরাপদ। বুদ্ধিমানের মত এই ব্যবস্থাই মেনে নেওয়া গেল। পরের চিঠিতে জানাব দার্জিলিঙের আর সব খবর।

নিষিদ্ধ দেশে

তোমার চিঠি পেয়ে ভারি খুশি হয়েছি। সবচেয়ে ভাল লাগছে তোমার প্রশ্নটা। সত্যিই তো তিব্বত-অভিযানের কথা না শুনলে অনেক কিছুই যে অজানা থেকে যায়।

তিব্বত কোথায় তা তো তুমি জানই। হিমালয়ের ওপারে এ যেন এক রূপকথার স্বপনপুরী। অচিনদেশের মায়াপুরীর মত এর নামটাই এতদিন শোনা ছিল আর মনের কোণে কল্পনার রঙে একটা আবছা আবছা আলপনা কাটা যেত। তিব্বত হল নিষিদ্ধ দেশ। নিষিদ্ধ দেশ কি বুঝলে তো? তার মানে বাইরে থেকে কোন বিদেশীই যেতে পায় না ওখানে। কাজেই তিব্বতের কথা আমরা বিশেষ কিছু জানতেও পারি নি অনেকদিন পর্যন্ত। বহু বছর আগে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করতে তিব্বতে গিয়েছিলেন বাঙালী মহাপুরুষ দীপংকর আর মহাগুরু পদ্মসম্ভব। এর অনেক বছর পরে বৌদ্ধ লামাদের সংগে ধর্ম আলোচনা করতে গিয়েছিলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। তখন তাঁর বয়স মোটে ষোল বছর। তারপর ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের কথা। এই বছরে নয়ান সিং আর তার পরের বছরে যান কিষাণ সিং। আবার অনেক

বছর চুপচাপ। তারপর ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে তিব্বতে গেলেন তোমারই দেশের লোক—শরৎদাস। তিনি তো এখানে বেড়ালেন অনেক জায়গায় আর দেখলেনও অনেক কিছু। তিনিই প্রথম অনেকগুলো বই লিখলেন তিব্বত সম্বন্ধে, আর তা থেকেই আমরা এখানকার অনেক কথা জানতে পারি।

বৌদ্ধ লামারাই হচ্ছেন তিব্বতের ধর্মগুরু বা পুরোহিত। তাঁদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বড় হলেন ডালয়লামা। সারা দেশের শাসনভার এঁরই হাতে। এঁর বিচার সকলকেই মানতে হবে, ইনিই হলেন দেশের সর্বেসর্বা। এঁর পরেই তাশিলামা। তিব্বতীদের ধর্মের ওপর ভারি টান। অন্য দেশের লোকের সংগে মিশলে পাছে ধর্মকর্ম নষ্ট হয় তাই এরা কোন বিদেশীকেই তাদের দেশে ঢুকতে দিত না।

ডালয়লামা

১৯০৪ খৃস্টাব্দের আগে তো কোন ইংরাজই ঢুকতে পারে নি

এই দেশে। ইউরোপের লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিব্বতে যান টমাস্ মেনিং। ইনি গিয়েছিলেন এখানকার রাজধানী লাসায়। ১৮০০ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বন্ধুত্ব হল ডালয়লামার সংগে। কিন্তু সে বন্ধুত্ব টেঁকলে তো। নেপাল থেকে গুর্খারা একবার তিব্বত আক্রমণ করলে। সেই সময়ে তাদের সাহায্য করলেন বৃটিশ সেনাপতি। সংগে সংগে সব বিদেশীদের তিব্বত যাওয়ার পথও গেল বন্ধ হয়ে। তারপর একশ বছরের মধ্যে তিব্বতে ঢুকতে পেরেছিলেন মাত্র তিনজন ইংরাজ। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্যাভেজ ল্যাণ্ডার। ইনি লাসায় যান উনিশ শ খৃস্টাব্দে।

তিব্বতীরা পথই বন্ধ করুক আর যাই করুক ইংরেজেরা ছাড়বে কেন? সারা পৃথিবীর সংগে তাদের জানাশোনা, সব দেশেই তাদের ব্যবসা বাণিজ্য—আর শুধু তিব্বতই থাকবে দৃষ্টির আড়ালে? তাই ১৯০৪ খৃস্টাব্দে লামার সংগে বন্দোবস্ত করে বিলাতের বৃটিশ মিলিটারি মিশন হতে একদল ইংরেজ চললেন লাসায়—তিব্বতের সংগে ইংলণ্ডের ব্যবসার পথ খুলতে। এফ্, ই, ইয়ংসব্যাণ্ড হলেন এঁদের দলপতি। ইংরেজদের এই তিব্বত যাওয়াটাই হল তিব্বত-অভিযান।

ভুটানের মহারাজের সংগে আগে থেকেই তো ইংরেজদের

বন্ধুত্ব ছিল। এবার তিনি লাসাযাত্রী ইংরেজদের খুব সাহায্য করলেন। তার ফলে ভুটানের মহারাজা পেলেন নাইট কম্যাণ্ডার অফ দি অর্ডার উপাধি আর সোনার পদক।

তিব্বত যাওয়ার পথে দার্জিলিঙে ওঠবার সময় এই দলেরই আড্ডা হয়েছিল সেই তিস্তা ভ্যালিতে।

এঁরা তিব্বতে পৌঁছলে খাম্বাজং প্রাসাদে লামাদের সংগে অনেক কথাবার্তা হয়।

এই হল তিব্বত-অভিযানের কথা। এখন আবার দার্জিলিঙের প্রথম দিনটার খবর শোন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মিত্র বোর্ডিংএ আমাদের জন্যে ঠিক-করা একটা ঘরে বসেছি সবাই মিলে। রঙিন ফুলকাটা কাগজে-মোড়া তার কাঠের দেয়াল। সামনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভুটিয়াদের বাড়ীর উঠোনে পোঁতা লম্বা বাঁশে বাঁধা বড় বড় পতাকাগুলো শীতের কন্‌কনে হাওয়ার সংগে হাততালি দিয়ে তালে তালে নাচছে। ওদিকের সরু উৎরাই পথ ধরে কুলি-মেয়েরা চুরুট মুখে দিয়ে গল্প করতে করতে চলেছে স্টেশনের দিকে। পথের পাশের ঝাউগাছের ডালে বসে কি একটা পাখী অনবরত চেঁচাচ্ছে। দুপুর হলেও তোমাদের ওখানকার মত ঝাঁ ঝাঁ দুপুর তো নয় এখানে— চারদিকের লোকেরা কাজ-কর্ম করছে—সবাই যেন কাজে

ব্যস্ত—কেমন একটা ব্যস্ত ব্যস্ত ভাব। দুপুরের কুঁড়েমির একটুও জায়গা নেই এখানে। দেখতে দেখতে পশ্চিমের পাহাড়টার আড়ালে সূর্যমামা নেমে পড়লেন।

বিকেলের দিকে বড়দের সংগে গেলুম বাড়ী খুঁজতে। সে যে কি মুস্কিলের ব্যাপার। যেখানে বাড়ীতে টু লেট লেখা বোর্ড ঝোলে সেখানে হয়তো বাড়ীওয়ালার পাত্তা মেলে না, আবার যেখানে বাড়ীওয়ালার দর্শন মেলে সেখানে আর বোর্ড ঝোলে না। যাই হোক মুস্কিলের আসান হল মর্গান রোডে এসে। কপালগুণে এখানে মিলল টু লেট লেখা সুন্দর একটি বাড়ী আর তার সদর দরজার ফাঁকে ফালি বারান্দায় ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে গুড়গুড়ির নল হাতে মস্ত বড় ভুঁড়িওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ীওয়ালা।

৫টার সময় গেলুম নতুন বাড়ীতে। শহরের প্রায় মাঝ-খানে মাঝারি রকমের বেশ সুন্দর বাড়ী। সবচেয়ে সুন্দর তার নবাবী ধরণের জমকালো মধুর নামটা—আর তার বাদসাহী চেহারার মোলায়েম নামের মালিক। আমাদের বাসাবাড়ী হুসেনমঞ্জিল আর বাড়ীওয়ালা গুপ্পামিয়া ভারি চমৎকার মিষ্টি মেজাজের লোক।

সত্যিই, আমাদের বাসাটা বেশ পছন্দসই। এমন জায়গায় বাড়ীটা যে, এর ছাদে উঠলে একই সংগে চোখে পড়ে

সমস্ত দার্জিলিং শহর আর তার চারদিকের বিচিত্র পার্বত্য দৃশ্য—মনে হয় যেন কোন দেবশিল্পী পাহাড়ের মাথার ওপর ঢেলে দিয়েছেন কতকগুলো নানান রঙের বাড়ী, তারই দুচারটে গড়িয়ে এসে পাহাড়ের নিচে অবধি পৌঁছেছে।

তুমি হয়তো এতক্ষণ পুকুরপাড়ে রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসে দার্জিলিঙের আমদানী কমলালেবু ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মজা করে খাচ্ছ আর আমরা কি করছি জান? আমরা ঘরের ভেতর আগুনতাতে বসে পায়ে তেল মালিশ করছি। বাড়ী খুঁজতে গিয়ে পাহাড়ে রাস্তায় কতবার যে চড়াই উৎরাই করতে হয়েছে। পায়ে ব্যথা না হয়ে আর যায় কি! এ তো আর বাংলার সমতল নয় যে সোজাসুজি চলে গেলেই হল। এখানে চলা ভারি মজার। পথ চলতে গেলেই হয় কোথাও চড়াইএ উঠতে হবে নয় তো উৎরাইএ নামতে হবে, সমান চলতে পাবে না কোথাও। এই ওঠা-নামা করে চলার মাঝে আবার বেশ কায়দা থাকা চাই। ওঠার সময় চলতে হবে সামনে ঝুঁকে আর নামতে হবে পেছনে ঝোঁক দিয়ে। এর উল্টো-পাল্টা করেছ কি হয় চিৎপাত, নয় মুখ থুব্‌ড়ে গড়্ গড়্ গড়াস্। পাহাড়ে পথে নামা বেশ সোজা, ওঠা কিন্তু ভারি মুস্কিল। প্রথম প্রথম উঠতে তো খুব পা ব্যথা করে আর হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণ যায় আর কি। তোমার সেই যে

হুট্ করে পথ চলা তো আর চলছে না এখানে। হয়তো হাসছ আর বলছ—হ্যাঁ, তাই আবার হয়, পাহাড়ে উঠতে এত কষ্ট হবে কেন? কেন তা বলছি শোন। তুমি তো জান বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটনের কথা—সেই যিনি আপেল ফল মাটিতে পড়তে দেখে আবিষ্কার করেছিলেন—পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে পৃথিবী তাকে টেনে রাখতে চাইছে। পৃথিবীর এই টেনে রাখবার ক্ষমতাটাই হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। গাছপালা জীবজন্তু মাটিপাথর যাই বল না কেন, সব কিছুকেই অন্তরের টান দিয়ে পৃথিবী টেনে রাখছে। তুমি যদি একখণ্ড পাথর তুলতে যাও তো পারবে কি? পৃথিবী যে তাকে টেনে রাখছে। পৃথিবী যত জোরে টানছে তার চেয়েও বেশি জোর যদি দাও তবে ওটাকে তুলতে পারবে। মানে পৃথিবীর সংগে তোমার একটা টাগ্-অব-ওয়ার হচ্ছে আর কি। এই অদৃশ্য বাঁধন দিয়ে পৃথিবী তোমাকে পর্যন্ত বেঁধে রেখেছে। তাই এর কাছ থেকে দূরে যেতে চাইলেই তোমাকে কাজ করতে হয় ঐ টানের উল্টো দিকে। ঐ টানের উল্টো দিকে কাজ করা তো বড় সোজা নয়। ওটাকে কাটিয়ে উঠতে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। এখানেও ঠিক একই ব্যাপার। পাহাড়ে ওঠবার সময় বার বার টেনে টেনে তুলতে হয় আমাদের শরীরের

ওজনটাকে। তবে ভাগ্যিস চলতে শেখার পর থেকেই আমরা শরীরটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই ছু এক মিনিটেই শ্রান্ত হই না। কিন্তু কতক্ষণই বা না হয়ে পারি ? দেখতে দেখতে বড় বড় হাঁ করে হাঁপাতে আরম্ভ করি। আবার পাহাড়ের ওপর আরও একটা ব্যাপার আছে। সমতলের চেয়ে অনেক উঁচু বলে এখানকার হাওয়াটা খুব হালকা। কাজে কাজেই যতটা নিঃশ্বাস টানলে সমতল দেশে আমাদের দরকারমত বাতাস পাই, পাহাড়ে সেইটুকু বাতাস পেতে হলে ঢের বেশি নিঃশ্বাস টানতে হয়। এজন্যেও আমাদের খুব তাড়াতাড়ি হাঁপ এসে পড়ে।

আর একটা কারণ হচ্ছে পায়ের পেশীর গড়ন। সমান যায়গায় চলে চলে আমাদের পায়ের পেশীগুলো গড়ে উঠেছে ঠিক সমতলে বেড়াবার যোগ্য হয়ে। পাহাড়ে চলতে পায়ের যে পেশীগুলোর দরকার, সমান যায়গায় চলতে সেগুলোকে কোন কাজকর্ম করতে হয় না। কাজেই কুঁড়ে ছেলের মত তারাও হয়ে পড়েছে একদম অকেজো। ঐ পেশীগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে বলেই চড়াইএ উঠতে আমাদের পা ব্যথা করে। পাহাড়ীদের বেলা কিন্তু অন্যরকম। তারা পাহাড়ে চলে চলেই মানুষ, তাই তাদের পায়ের পেশীগুলোও বেশ জোরালো। কাজেই পাহাড়ে উঠতে আমাদের মত এত কষ্ট

হয় না ওদের। তবে মজা হচ্ছে এই, তোমার মত সমতলে চলতে হলে ওদেরও প্রথম প্রথম মুস্কিলে পড়তে হবে।

যাই হক পাহাড়ে ওঠার কষ্টটা ধীরে ধীরে সয়ে যাবে এই ভরসাতেই তো নতুন বাসায় গোছগাছ স্থরু করা গেল— আর তা শেষ হল রাত দশটায়। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে না পড়তেই নাসিকাগর্জন আর কি। তুমি ততক্ষণে স্বপনবুড়োর সাথে সাথে চৌদ্দ ভুবনে ঘুরপাক খাচ্ছ।

তখন সবে গাছপালার মাথা হতে রাতের আঁধার ধীরে ধীরে সরে যেতে আরম্ভ করেছে, শীতের শিরশিরে হাওয়া ঝাউগাছের পাতায় পাতায় কাঁপন তুলেছে, পালকের লেপ মুড়ি দিয়ে বাচ্চাগুলিকে বুকে জড়িয়ে পাখীরা তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ বা ঘুমের ঘোরে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে জাগবার চেষ্টা করছে, ঘুমটা যদিও ভেঙেছিল তবু বিছানা ছাড়বার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি—এমন সময় দাদার ডাকে তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে যা দেখলুম—সে কি লিখে বোঝান যায়। উত্তরদিকে আধ-আলোয় আধ-আঁধারে কাছের পাহাড়টার কালোর পোঁচ দেওয়া ঘন সবুজ দেহ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে আর তার পেছনে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটীর মত ধীর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড় ঘন নীল রঙের। সবশেষে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজংঘার আকাশ-ছোঁয়া বরফঢাকা চূড়াগুলি তপ্ত কাঞ্চনের মতই উজ্জ্বল। নতুন সূর্যের সোনালী আলোটুকু বরফের ওপর পড়ে তাকে সোনার রঙেই রঙিন করে তুলেছে। মনে হচ্ছে যেন বিরাট ঘনশ্যাম মূর্তির মাথায় প্রকৃতি দেবী নিজের হাতে সোনার

মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। সে যে কি অপরূপ সুন্দর, যদি দেখতে।

কাঞ্চনজংঘার এ রূপ কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। পূব-আকাশের কোলে সূয্যিমামা দর্শন দিতে দিতেই সমস্ত পাহাড়টা হয়ে যায় ধব্‌ধবে সাদা। তবে সেও কি কম সুন্দর ? নীল আকাশের কোলে ঢেউ-খেলানো মাথা তুলে রূপোর মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে অগুণতি বরফের পাহাড়—দুপাশে যতদূর দেখা যায়। আজ অবশ্য আকাশ খুব পরিষ্কার রয়েছে বলেই, নইলে কাঞ্চনজংঘা বেশির ভাগ ঘোমটা টেনেই থাকেন। যেমন তুষারময় কলেবর তেমনিই নবঘন অবগুণ্ঠন।

চা-পানটা সেরে ঠাকুর চাকর ঠিক করতেই তো গেল বেলা হয়ে। তার ওপরে আবার আমাদের না জানিয়েই কখন যে জল চলে গেছে কল থেকে। কাজেই কোন রকমে জল চেয়ে এনে খাওয়াদাওয়া শেষ করে সারাদিনের মত বিশ্রাম।

হ্যাঁ, এদেশে ঝি-চাকরদের কি বলে জান তো ? চাকর-দের বলে কেটা, ঝিদের বলে কেটি আর বেশি বয়সের ঝিদের বলে নানি। এখন কেটা কেটি আর নানি মানে কি বল দেখি ? পারলে না তো ? কেটা মানে বালক, কেটি মানে বালিকা আর নানি মানে হচ্ছে দিদি। এগুলো অবশ্য পাহাড়ীদের ভাষা।

বেলা তখন পাঁচটা, সূয্যিমামা নেমে পড়েছেন পশ্চিম-দিকের পাহাড়টার আড়ালে। সংগে সংগে রোদের ছোঁয়াচ-টুকু মুছে গিয়ে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে মেঘলা দিনের মিষ্টি নরম আলো। খানিক পরে সে আলোটুকুও গেল আকাশের কোল থেকে মুছে আর ধীরে ধীরে সাঁঝের আঁধার এল পাহাড়ের বুকে নেমে। অমনি সারা শহরের রাস্তার আর বাড়ীর বিজলী বাতিগুলি হাজার হাজার জোনাকীর মত ফুট্-ফুট্ করে জ্বলে উঠল। নীল আকাশের বুকে তখন তারার মালা সহরের আলোর সংগে মেশামিশি হয়ে গেছে। সারা দার্জিলিং শহরটা যেন আকাশের কোলে কোন যক্ষ-দেশের যক্ষপুরী।

ঠিক হল কাল থেকে আমরা এখানকার যা কিছু দেখবার সব দেখে শুনে বেড়াব। অমনি সংগে সংগে ওখান থেকে তুমিও বুঝি দাজিলিংটা বেড়িয়ে নেবে? তাহলে এর ভূগোলটা একটু জেনে নাও, নইলে পথ ভুল হয়ে যাবে যে।

সেই যে ঘুমের কথা বলেছি না? সেই ঘুম পাহাড়ের উত্তরদিক থেকে বেরিয়েছে আর একটা পাহাড় অর্দ্ধচন্দ্রের মত। এর নাম দার্জিলিং জলাপাহাড়। জলা মানে স্যাঁত-সেঁতে। মেঘ-কুয়াসায় ঢাকা তার ওপরে ইলশে-গুঁড়ির তো কামাই নেই, কাজেই সব সময়ে ভিজে থাকে বলেই

হয়তো এ পাহাড়টার এমনি নাম। এরই পশ্চিম গায়ে খাস দার্জিলিং শহর। পূবদিকেও যে বসতি নেই তা নয় তবে পশ্চিমের তুলনায় অনেক কম। পাহাড়ের দেহখানি জুড়ে থাকে থাকে তৈরি শহরের বাড়ীগুলি ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে ভারি সুন্দর দেখায়।

দার্জিলিং জলাপাহাড়ের গড়নটা বেশ ঢেউকাটা। উত্তর দক্ষিণ দুমাথায় দুটি চূড়া আর মাঝখানে আর একটি। উত্তর-দিকের চূড়াটি সবচেয়ে ছোট—নাম বার্চ হিল, দক্ষিণদিকেরটি সবচেয়ে উঁচু—নাম হল জলাপাহাড়, আর মাঝেরটি মহাকাল চূড়া বা অবজারভেটারি হিল। এরই মাথার ওপর বিরাজ করছেন দুর্জয়লিংগ মহাদেব আর তাঁরই নাম থেকে দার্জিলিং শহর নাম পেয়েছে। এখানকার কোন কোন বৌদ্ধ বলেন—অনেক আগে এখানে বাস করতেন দর্জে নামে এক লামা। তিনি ছিলেন খুব সাধুপুরুষ আর ভুটিয়ারা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত, এখন তো তাঁকে দেবতা বলেই মনে করে। সেই দর্জে লামার নাম থেকেই হয়েছে দার্জিলিং। যাই হোক নামের কসরৎ নিয়ে মাথা ঘামালে তো আর চলবে না, এখন আসল কথাটা আরম্ভ করা যাক।

ভূগোলে তো পড়েইছ দার্জিলিং জেলার মাপ হচ্ছে বার শ চৌত্রিশ বর্গমাইল। দুদিকে দু গুর্খা দারোয়ানের মত এর

পূবে ভুটান আর পশ্চিমে নেপাল। এদের মাঝখানে থেকে উত্তরে সিকিম রাজ্যের গা ঘেঁসে ছড়িয়ে পড়েছে দার্জিলিং জেলা। দক্ষিণে কি তাও আবার বলে দিতে হবে নাকি? দার্জিলিং জেলার দক্ষিণে শস্যশ্যামলা বাংলার সমতল ভূমি—যার কোমল কোলে নিত্যি নতুন উৎপাত করে বেড়াচ্ছে নন্তুবাবু তার ছোট বড় ভাইবোনদের নিয়ে।

দার্জিলিং জেলায় কত লোক থাকে জান? সবশুদ্ধ প্রায় ২২০৩১৪ জন লোক বাস করে সারা দার্জিলিং জেলায়। তুমি তো ওখানে অনেক শহরে বেরিয়েছ। এখানে কিন্তু ওখানকার মত অত শহরের ঠেসাঠেসি নাই। এই জেলায় নাম করবার মত শহর মাত্র তিনটে—দার্জিলিং কার্সিয়াং আর কালিমপঙ, আর ছোট বড় সবে মিলে গ্রাম হল ১৩১৭টি।

বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেছেন দার্জিলিং জেল্লার জমি (ভূপৃষ্ঠ) নাকি পাঁচ রকম্মের পাথর দিয়ে তৈরি। তুমি তো তাদের নাম জান না, তাদের নাম হচ্ছে—নীস বক্সাসিরিজ ডার্লিংসিরিজ গোন্দয়ানা আর টার্সিয়ারী। কয়লা তামা লোহা হেমাটাইট এইসব দরকারী জিনিসের খোঁজ পাওয়া গেছে দার্জিলিং জেলার অনেক জায়গায়। তা হলে কি হবে—সে সব কিন্তু যেখানকার জিনিস সেখানেই আছে, এখনো

কোন কাজেই লাগান হয় নি। ওই জগদ্দল পাথর কেটে সে সব তোলা কি সহজ?

তুমি হয়তো মনে করছ পাহাড়ের ওপর বলে দার্জিলিং একেবারে কাঠখোট্টা শুকনো জায়গা—গাছপালা হয়তো জন্মায় না ওখানে। মোটেই তা নয়। এখানে বরং সমতলের চেয়ে গাছপালা অনেক বেশি। হাওয়ায় জলের ভাগ খুব বেশি আছে বলে এখানকার গাছপালাও বেশ সতেজ। তাদের বাড়তিও যেমন রকমারিও তেমনি। সারা দার্জিলিং জলাপাহাড়টা আর তাদের আশেপাশে যত পাহাড় চোখে পড়ে সব আগাগোড়া সবুজে মোড়া। আর সে সবুজই বা কত রকমের—ঘন সবুজ ফিকে সবুজ হলদের আভা-দেয়া সবুজ নীলের আমেজ-লাগা সবুজ—সে যে কি সবুজের ছড়াছড়ি। আবার সেই সবুজের মাঝে মাঝে আগাগোড়া ফুলে-ভরা আগুন-লাগা রঙের রডোডেন্‌ড্রন গাছ দাঁড়িয়ে যেন ভেলভেটের কিংখাপের ওপর পান্নার কাজের সংগে চুনীর সাজের বাহার তুলেছে। কত রকমের ঝাউ, নানান রকমের দেবদারু, বড় বড় শাল সেগুন শিশু এই সব বাহাদুরী কাঠ যথেষ্ট পাওয়া যায় দার্জিলিং জেলার পাহাড়ে অংশটায়। ফল-ফুলুরি মশলাপাতিও কি কম জন্মায় এখানে? আমলকী, হরীতকী বহেরা ম্যাপল থেকে আরম্ভ করে জলপাই তেঁতুল

পিটুলী টুন তুঁত, আবার মৌরী দারুচিনি বড়এলাচ খয়ের এইসব মশলাও এখানে পাওয়া যায় প্রচুর। অনেক জায়গায় কমলা নাশপাতি পীচ আঙুর আনারস পেয়ারা কলা এইসব ফল জন্মায় ঝুড়ি ঝুড়ি। জিভে জল আসছে বুঝি? যাও না চুপিচুপি ভাঁড়ার ঘরে, রান্নাদি তো এখন খুব ঘুম দিচ্ছেন।

এইবার ফুলের কথা—এত রকমের ফুলগাছ তোমার বাগিচায় কক্ষণো ধরবে না। নানান রঙের গোলাপ স্থলপদ্ম তুলীচাঁপা রজনীগন্ধা হাজার রকমের সীজন ফ্লাওয়ার রডোডেনড্রন, সিনেরিয়া, আরও কত রকমের পার্বত্য ফুল যে হয় এখানে। কিন্তু হলে হবে কি—এসব ফুল রূপ আর রঙের ছটায় হয়তো তোমার চোখ ঝলসে দেবে কিন্তু গন্ধের বেলায় সব ফাঁকি। খুব শীত কিনা তাই এখানকার ফুলে গন্ধ নেই। এখানকার তরুলতা ঝুলন্ত শেওলা মস আর পরগাছাগুলোও ভারি সুন্দর। ইউরোপ আমেরিকা থেকে যাঁরা আসেন এখানে বেড়াতে তাঁরা তো এইসব পরগাছাগুলো অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যান বাগান সাজাতে।

ভাবছ বুঝি ফুলফলের বাগানেই দার্জিলিং জেলাটা ভর্তি? তা নয়, বাঘ হাতী গণ্ডার বড় বড় পাহাড়ে সাপ হরিণ

বুনো ছাগল সবই আছে এখানকার জংগলে, তবে তারা থাকে প্রায় খুব নিচের দিকে। ওপরে কিনা খুব শীত তাই এখানে থাকা তাদের পোষায় না। দার্জিলিঙের তরাই অঞ্চলে দেখা যায় বড় বড় ভীষণ পাহাড়ে বোরা সাপ। প্রায় পাঁচ ছ শ রকমের সুন্দর পাখী আছে এই অঞ্চলে আর আছে ছ শ রকমের আশ্চর্য সুন্দর প্রজাপতি।

ভীষণ পাহাড়ে বোরা সাপ

এমন যে দার্জিলিং জেলা এটা কিন্তু আগে বৃটিশরাজের অধীনে ছিল না। সিকিমের রাজা ছিলেন এর মালিক। সেই সময়ে গুর্খাদের রাজা ছিলেন পৃথ্বীনারায়ণ। এঁর ভারি ইচ্ছে হল নিজের রাজ্য বিস্তার করতে। কাজেই পৃথ্বীনারায়ণ দিলেন পাশাপাশি রাজাদের সংগে যুদ্ধ আরম্ভ করে। সিকিমও কিছু বাদ গেল না। সিকিমরাজ রাজ্য হারিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আশ্রয় নিলেন। এর ক বছর পরেই নেপালের সংগে বৃটিশদের হল ভারি একটা যুদ্ধ। নেপালের রাজা গেলেন হেরে। তখন বৃটিশদের

সেনাপতি ছিলেন স্যার ডেভিড্ অক্টারলোনি। নেপালরাজ দেখলেন সন্ধি ছাড়া আর উপায় নেই। কাজেই তিনি অক্টারলোনির সংগে সন্ধি করলেন সিকিম আর তার দক্ষিণের খানিকটা অংশ ইংরেজদের দিয়ে। রাজ্য হারিয়ে সিকিমরাজ তখনও ইংরেজদেরই আশ্রয়ে। ইংরেজরা তাঁকে তাঁর রাজ্যটি দিলেন ফিরিয়ে। তখন থেকেই সিকিম হল ইংরেজদের মিত্ররাজ্য।

কিন্তু ঝগড়া কি আর সহজে মেটে ? এর ক বছর পরেই রাজ্যের সীমানা নিয়ে নেপাল আর সিকিমে বাধল তুমুল ঝগড়া। আর এই ঝগড়া মেটাতে গেলেন মেজর বয়েড সাহেব বৃটিশ গভর্নরের প্রতিনিধি হয়ে।

এই সময়েই মেজর সাহেবের নজর পড়ল দার্জিলিঙের ওপর। এখানকার জল হাওয়া বেশ ভাল, লোকগুলোর স্বাস্থ্যও বড় মন্দ নয়। তার ওপরে ভারতের আর আর জায়গার মত গরমে কষ্ট পেতে হয় না দেখে মেজর সাহেব সিকিমের রাজাকে বললেন—আপনি যদি গভর্নর জেনারেলকে দার্জিলিং শহরটি দেন তা হলে তিনি খুব খুশি হবেন।

লর্ড বেণ্টিংক তখন ভারতের শাসনকর্তা। সিকিমরাজ বছরে তিন হাজার টাকা বৃত্তির বদলে দার্জিলিঙের পাহাড়ে

অংশটা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিলেন। সে হচ্ছে এক শ ছ বছর আগেকার কথা। *

তারপর তের বছর গেল কেটে। তখনকার নামজাদা ডাক্তার হুকার সাহেব আর দার্জিলিঙের জেলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাম্বেল সাহেব গেলেন সিকিমরাজ্যে বেড়াতে, সিকিমরাজ আর ইংরেজরাজ দুপক্ষেরই হুকুম নিয়ে। কিন্তু তা হলে কি হয়, সিকিমের রাজমন্ত্রী ছিলেন ভারি কুচক্রী। তিনি তো নানান কথা বলে কু-পরামর্শ দিয়ে রাজার মন দিলেন বিগড়ে। ফলে রাজমন্ত্রীর কলেকৌশলে হুকার সাহেবেরা হলেন বন্দী।

এ খবর ইংরেজদের কাছে গেল। তাঁরাই বা ছাড়বেন কেন? বৃটিশরাজ মস্ত বড় একদল সেনা পাঠালেন সিকিম-রাজকে শিক্ষা দিতে। ফলে হল কি তরাইএর ছ শ চল্লিশ বর্গমাইল জমি ইংরেজরা দখল করে নিলেন। সেটা হল ১৮৫০ খৃস্টাব্দের কথা। এর চোদ্দ বছর পর আবার একটা লড়াই বাধে, সেইটাই ভুটানযুদ্ধ। এই সময়েই তিস্তানদীর পূবদিকের সমস্ত অংশটি দার্জিলিঙের সামিল হল। এমনি করে সারা দার্জিলিং জেলাটাই এল ইংরেজদের হাতে। দার্জিলিং তখন তো আর এখনকার মত বড় শহর

* ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে।

ছিল না, তখন এখানে ছিল মাত্র ঘর কয়েক লোকের বাস —সামান্য একটা বস্তি বললেই হয়। এখানে শহর গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন জেনারেল লয়েড সাহেব। তারপর আস্তে আস্তে সামান্য বস্তিটা হয়ে উঠল একটা বিরাট শহর, আর সেই শহরে আজ এসে পড়লুম আমরা।

কোন জায়গার কথা শুনতে হলে সেখানকার ইতিহাস-ভূগোলটা আগে জানতে হয়, নইলে যে সেই দেশের কথাটা পুরোপুরি জানা হয় না। দার্জিলিঙের ইতিহাস-ভূগোলটা তো তোমার মোটামুটি জানা হল, এখন ঘুমোতে যাওয়া যাক, কি বল ?

মহাকাল

আজকের সকালটা ভারি চমৎকার। পরিষ্কার নীল আকাশে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ঝক্‌ঝকে সোনালী রোদ আর তারই একফালি এসে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে আমার ঘরে। কন্‌কনে শীতের সকালে ভারি মিষ্টি লাগছে ঐ রোদটুকু। এমন সময়ে দার্জিলিঙের মত জায়গায় কি চুপটি করে বসে থাকা যায়? তুমিই বল না? দল বেঁধে বেরিয়ে পড়া গেল নতুন শহরের অচেনা পথে। আমাদের বাসার ঠিক সামনেই পাহাড়ের কাঁধে উঠেছে মর্গান রোড। আরও একটু ওপরে উঠলেই কার্ট রোড। এইটাই এখানকার সবচেয়ে বড় রাস্তা—দার্জিলিঙের ঠিক মাঝখান দিয়ে মুখ নামিয়ে চলে গেছে শিলিগুড়ি অবধি। কার্ট রোডের সারা গায়ে পিচ ঢালা, মনে করলেই তুমি আরাম করে মোটর হাঁকিয়ে যেতে পার শিলিগুড়ি পর্যন্ত এর বুকের ওপর দিয়ে। কার্ট রোডের দুপাশে তরকারি ফল মাছ মাংস হতে আরম্ভ করে কাপড় মনিহারী সব কিছু দরকারী জিনিসেরই সারিবন্দি দোকান। এখানটাই যেন দার্জিলিঙের বড়বাজার। এত দোকানের

ঠাসাঠাসি আর কোন রাস্তাতেই নেই। এখানকার বেশির ভাগ দোকানই হয় ভুটিয়া নয় তো তিব্বতীদের। কত দোকানে দোকানদারি করছে মেয়েরা।

রাস্তা দিয়ে চলেছি দল বেঁধে। কত দোকানদার ডাকছে—আইয়ে বাবু, বহুত বড়িয়া চিজ ছে। আমাদের তো আর চিজের দরকার নেই, তারা তবু ডাকতে ছাড়ে না। শেষে এক বুড়ো ভুটিয়ার ডাক এড়াতে না পেরে ঢুকে পড়লুম তার দোকানে। বুড়ো একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল আর কি। একগাল হেসে ভারি আদর করে আমাদের চেয়ারে বসিয়ে কতরকম কথা বলে তার জিনিসের প্রশংসা করলে আর প্রত্যেকটি জিনিস দেখিয়ে দেখিয়ে কেনবার জন্যে এমন করে অনুরোধ করতে লাগল যে দরকার না থাকলেও আমাদের কিছু কিনতেই হল। এত চতুর দোকানদার এরা। দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছি। ভুটিয়াদের দোকানের মাঝে মাঝে তিব্বতীদের কিউরিও শপ —মানে নানানতর পুরোনো জিনিসের দোকান আর কি। এইসব দোকানে গাদাগাদি করে সাজানো রয়েছে তিব্বতের তৈরি নানান রকমের খেলনা, সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা লাল নীল পাথর-বসানো নানান রকমের বাসন-পত্তর, কত রকমের গয়নাগাঁটি, কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি,

তিব্বতের পট, কাঁচের মালা, পুঁতির মালা আরও কত কি। এক একটা দোকানে রয়েছে ভারি সুন্দর ফুললতাপাতা-আঁকা পেপার মেশিওর জিনিস। পেপার মেশিও কি বুঝলে না তো? পেপার মেশিও হচ্ছে কাগজের মণ্ড। যত সব ছেঁড়া বাজে কাগজ পচিয়ে পিষে কেমন একটা মণ্ডের মত তৈরি করে এরা, আর তাই দিয়ে চমৎকার কৌটা বাক্স ট্রে ফুলদান এই সব তৈরি হয়। জিনিসগুলো হয় খুব হাল্কা অথচ দেখতে ভারি সুন্দর। দেখতে দেখতে চলেছি—আশে পাশে সামনে চ্যাপটামুখো গোলগাল খোকাখুকুরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে আমাদের দিকে আর সরল হাসিতে লালমুখ আরও লাল করে যাচ্ছে একটু সরে। তোমাদের ওখানকার একঘেয়েমির ভাবটা যেন নেই এখানে। নতুনের আনন্দে সারা মন ছাপিয়ে উঠছে। একটু পরেই এসে পড়লুম বাজারের দক্ষিণদিকে। এখানে কার্ট রোড় থেকে বেরিয়েছে মেকেঞ্জি রোড। এই রাস্তাটার এদেশে খুব নাম। হবে না-ই বা কেন বল? বোর্ডিং পোস্ট-অফিস ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ম্যাডান থিয়েটার সাহেবী হোটেল বীচ উড আরও কত নামজাদা বড় বড় বাড়ী—সবই যে এই মেকেঞ্জি রোডের ওপরে। এই রাস্তা ধরে খানিক দূর উঠলেই অকল্যাণ্ড রোডের মোড়। অকল্যাণ্ড রোড এসেছে সেই ঘুম স্টেশন

থেকে প্রায় চার মাইল পাড়ি দিয়ে। এই রাস্তাটা মেকেঞ্জি রোডে পড়বার পরেই মেকেঞ্জি তার নাম হারিয়ে নতুন নাম পেয়েছে—কমার্শিয়াল রো। কমার্শিয়াল রো ধরে উঠছি, বেশ খাড়াই রাস্তা তাই পাগুলোও আর চলতে নারাজ। এদিকে আর একটু উঠলেই চৌরাস্তা—বেড়াবার সব চাইতে ভাল জায়গা। এখানটা না দেখে কি আর বাড়ী ফেরা যায়! চৌরাস্তা যেন দার্জিলিঙের বুকের মাঝখানে, এর সাহেবী নাম মল। কষ্টেস্থষ্টে পা টেনে টেনে এগুচ্ছি—কানে ভেসে এল অর্গানের ভারি মিষ্টি সুর আর তার সংগে মেশানো আরও মিষ্টি গলার গান। পায়ের ব্যথা সব ভুলে গেলুম আর কি। আবার নতুন উৎসাহে নতুন পথে চলতে সুরু করা গেল। চৌরাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশ-পানে উঁকি মারছে অবজারভেটরি হিল বা মহাকাল চূড়া। এর ঠিক দক্ষিণে এসে কমার্শিয়াল রো দুভাগে ভাগ হয়েছে। একটা ভাগ ওয়েস্ট মল রোড নাম নিয়ে চলে গেছে মহাকাল চূড়ার পশ্চিম গা বয়ে, আর একটা ইস্ট মল রোড নাম নিয়ে মহাকালের পূবদিক ঘেঁসে লাট সাহেবের বাড়ীর সামনে এসে মিলেছে ওয়েস্ট মলের সংগে। এখন বুঝলে তো চৌরাস্তায় কেন এত বেড়াবার ভিড়? মহাকাল চক্কর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চারদিকে অনেকদূর

পর্যন্ত পার্বত্য দৃশ্যটি দেখতে পাওয়া যায় বলে। একেই তো এখানটা খুব উচুঁতে তার ওপরে আবার এই রাস্তা দুটোর ধারে একটিও বাড়ী নেই, চারদিকে দেখা যাচ্ছে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে নীল পাহাড়ের ঢেউ। কাছের পাহাড়ের কোলে কোলে ছোট ছোট বস্তি। বস্তির লাল রঙের ছাদওয়ালা বাড়ীগুলি পাহাড়ের ঘাড়ে পিঠে এখানে ওখানে অনেকদূর অবধি ছড়ানো। ঠিক যেন খানকতক ইট পড়ে রয়েছে পাহাড়ের ওপর।

চৌরাস্তার প্রথম মুখেই বেশ বড় একটা সাহেবী হোটেল। এখানটা সাহেবদের নাচ-গানের বড় আড্ডা। এর সামনেই যেখান থেকে ইস্ট মল আর ওয়েস্ট মল রোড বেরিয়েছে সেখানে ছোট একটু ফুলবাগিচা। মাঝখানে বসবার জন্যে খানকতক বেঞ্চ পাতা আর চারদিক ঘিরে ছোট ছোট গাছে ফুটে রয়েছে নানান রঙের অজস্র ফুল। এর সামনেই বেশ বড় একটা ফুলের দোকান। এখানে তো ফুলের মেলা বসেছে। কাচের ঘরের ভেতর কত রকমারি ফুল। যেমন তাদের রং তেমনি গড়ন। ফুলের দোকান ডাইনে রেখে ইস্ট মল রোড ধরে একটু যেতেই বাঁদিকে মহাকালে ওঠবার পথ।

মহাকালে উঠতে সুরু করেছি। খানিকটা উঠেই দেখি

পাহাড়ের গা কেটে অনেকখানি জায়গা সমান করে তৈরি হয়েছে সাহেবদের টেনিস খেলার মাঠ, আর তার গায়েই রয়েছে সাহেবী হোটেল এডা ভিলা। দেখতে দেখতে কখন এসে পৌঁছে গেছি মহাকালে। পাহাড়ের মাথাটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে বেশ সমান। চার পাশে একটু নিচে ছোট বড় নানান আকারের নানান-রকম গাছ। কোথাও বা বড় বড় ঝাউগাছ চামর-ঢুলানো মাথা ছুলিয়ে শিস্ দিচ্ছে, কোনোখানে আবার সোজা সোজা পাহাড়ে বাঁশগাছগুলো সরু লিকলিকে দেহ নিয়ে একসংগে দল বেঁধে মাথা নেড়ে নেড়ে কটকটি গান আরম্ভ করে দিয়েছে, ফাঁকে ফাঁকে কোথাও ছু একটি রডোডেনড্রন গাছ সবুজের মাঝে হঠাৎ মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিচ্ছে। জায়গাটি ভারি চমৎকার। উত্তরদিকে ছোট ছোট সুন্দর ছাউনির নিচে খানকতক বেঞ্চ পাতা। এরই একখানা দখল করে বসা গেল সবাই মিলে। তারপর সামনে যা দেখলুম তা আর কি বলব। দূরে—অনেক দূরে যেখানে নীল পাহাড়ে আর নীল আকাশে মেশামিশি হয়ে এক হয়ে গেছে ঠিক সেখানটার অনেকখানি উঁচুতে শূন্যের ওপর ঝকমক করছে হিমালয়ের বরফঢাকা চূড়াগুলি ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে। হাজার হাজার কোহিনূরের ঠিক্‌রে-পড়া জ্যোতি হার মেনে যায়

এর কাছে। সে অমল ধবল রূপের কি আর তুলনা মেলে। এমন দৃশ্যটি জগতের আর কোথাও নেই। দেখতে দেখতে সব ভুলে যেতে হয়—নিজেকেও আর মনে থাকে না। সত্যিই এ অপরূপ রূপের কথা বলতে ভাষায় কুলোয় না, তাই ইংরেজ লেখক বলেছেন—ভগবান যখন মানুষকে ভাষা দিয়েছিলেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে সে আবার হিমালয়ের কথা কিছু বলতে চায়, তাই এর রূপ কথায় প্রকাশ করবার মত ভাষাও কিছু নেই।

আমাদের পাশেই মাঝারি রকমের বেশ সুন্দর সবুজ রং-করা এক কাঠের ছাউনি। এটাই হল এখানকার অবজার-ভেটারি বা মানমন্দির। এর ভেতর কাচের বাক্সে রয়েছে হিমালয়ের বরফ-ঢাকা চূড়াগুলির ম্যাপ, চারদিককার নক্সা আর চার্ট। তাই দেখে কাঞ্চনজংঘা আর তার ভাইবোনদের সব চিনে নিলুম। মাঝখানে সব চাইতে উঁচু যে চূড়াটি দেখা যাচ্ছে না, ঐটিই কাঞ্চনজংঘা সমুদ্রপিঠ থেকে ২৮১৫৬ ফুট উঁচু। এখন এর একটা দিক গেছে ধ্বসে। আচ্ছা নামটা কি করে কাঞ্চনজংঘা হল বল দেখি? তুমি হয়তো ভাবছ, সকালবেলা সোনার রঙে রঙিন হয় বলেই এর এমনি নাম। ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকমের। লেপচা-দের ভাষায় কাঞ্চনজংঘা হয়েছে ক্যাঙ্‌ চেন জো আর ঙ্গা

এই চারটি পদ নিয়ে। ক্যাঙ্ মানে তুষার, চেন—বড়, জো—ধনভাণ্ডার আর ঙ্গা—পাঁচটি, এখন ক্যাঙ্ চেন জো ঙ্গা মানে তুষারের পাঁচটি বড় ভাণ্ডার আর কি। কাঞ্চনজংঘার পূবদিক ঘেঁসে পর পর চলে গেছে পন্দিম জুবান্নু স্বয়ম্ভু সিনিয়লচুম চোমিয়ামো এই সব। পশ্চিমদিকে টালুং আর ডোম শিখর। তাদের পশ্চিমে জহ্নু আর কাব্রু।

সব শেষে ক্যাঙ্ শিখর।

বেঞ্চে বসে সবাই মিলে চেয়ে দেখছি অপরূপ দৃশ্য, পাশে একজন বিদেশী ভ্রমণকারী হাতের পেন্সিল মুখে দিয়ে নীল চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন কাঞ্চনজংঘার দিকে আর মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে বলছেন—কি সুন্দর কি সুন্দর, এমন সময়ে কোত্থেকে এলোমেলো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ উড়ে এসে অমন সুন্দর ছবিটাকে বেমালুম মুছে দিলে আকাশপট থেকে। আমদেরও চমক ভাঙল, ফিরে চললুম দুর্জয়লিংগ দেখতে।

মহাকাল চূড়ার ঠিক মাঝখানটা সবচেয়ে উঁচু। এই-খানেই দুর্জয়লিংগদেবের মন্দির। মন্দির বলতে তো কিছু নেই, এক বিরাট বেদীর ওপর স্থাপিত রয়েছেন সিন্দুর-মাখা বিরাট শিলালিংগ আর তার পাশে ছোট ছোট পাথরে খোদাই বুদ্ধদেব আর কালীমূর্তি। বেদীর চারদিকে বড়

বড় বাঁশ পোঁতা, তাতে লম্বালম্বি বাঁধা রয়েছে বড় বড় কাপড় পতাকার মত করে। ঐ সব কাপড়ে লেখা আছে ভুটিয়াদের

বাঁধা রয়েছে বড় বড় কাপড় পতাকার মত করে

কল্যাণ-মন্ত্র। কত কাগজেও আবার ঐ সব মন্ত্র লিখে

টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে বেদীর চারদিকে—ঠিক যেমন করে তোমরা আমশাখার মালা টাঙাও পূজাবাড়ী সাজাতে। ভুটিয়াদের বিশ্বাস ঐ সব মন্ত্র হাওয়ায় ভর করে বরাবর চলে যাবে স্বর্গে, সেখান থেকে সটান পৌঁছবে দেবতার কাছে। দেবতাও অমনি খুশি হয়ে দেবেন তাদের সমস্ত অকল্যাণ দূর করে। অনেকে আবার বলে এইতেই মৃত আত্মীয়স্বজনরা ভূত হয়ে এসে আর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না তাদের। এইজন্যেই সব ভুটিয়াদের বাড়ীর উঠোনে আছে এমনিধারা পতাকা পোঁতা। যাই হোক মহাকালে পতাকাগুলো থেকে কিন্তু ভালই হয়েছে। তাদেরই ছায়ায় একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে আমরা সব বসে পড়লুম পূজা দর্শনের আশায়, আর নেহাৎ যদি ভাগ্যে থাকে তো একটু আধটু প্রসাদও জুটে যেতে পারে। তখন সবে পূজা আরম্ভ হয়েছে। বেদীর সামনে আসনে বসে তিব্বতী পুরোহিত বাঁ-হাতে ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে দুধ চাল সব ঢালছেন বেদীতে আর হড়বড় করে পড়ে যাচ্ছেন মন্ত্র। ভগবান মহাকাল সে মন্ত্র বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যে তার বিন্দুবিসর্গও বুঝিনি একথা খুব সত্যি। পূজার প্রণালী সবই সেই আমাদের মত। পূজার উপকরণ সেই ধূপ দীপ নৈবেদ্য ফুল—সেই জল ছিটিয়ে ধূপধুনোর প্রদীপ ঘুরিয়ে

চামর ঢুলিয়ে সেইরকমই আরতি। আরতিশেষে লম্বা প্রণাম করে পুরোহিত পূজা শেষ করলেন। একটু দূরে একটি পাহাড়ী মেয়ে হাত যোড় করে ভারি সুন্দরভাবে প্রণাম করছে শিলালিংগকে, এমন সময় দুজন ভুটিয়া এল মন্ত্রলেখা নতুন পতাকা নিয়ে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে পতাকা শুদ্ধ করে দিলে তারা দেবতার পিছনে ওটা দিলে পুঁতে। একটু পরেই দলে দলে আসতে লাগল নেপালী ভুটিয়া বেহারী বাঙালী আর পূজার জিনিস বা প্রণামী দিয়ে পুরোহিতের হাতে প্রসাদী সিন্দুরের টিপ পরে দেবতা প্রণাম করে চলে গেল যে যার জায়গায়। এক মেমসাহেব ছিলেন দূরে প্রায় আমাদের কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। পুরোহিত ঠাকুর তো বরাবর এসে দিলেন তাঁর কপালে প্রসাদী সিঁদুরের টিপ পরিয়ে। বেচারী মেমসাহেব খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের পানে চেয়ে একটু হেসে ফেললেন, তারপর সবার দেখাদেখি বাঁ-হাতের ব্যাগ খুলে দুআনা পয়সা বের করে পুরোহিতকে দিলেন প্রণামী। পুরোহিত ঠাকুর বেজায় খুশি, এক গাল হেসে সিঁদুর মাখা ডান-হাতখানি মেমসাহেবের ঝাঁকড়া সোনালী চুলে ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করে বসলেন গিয়ে নিজের আসনে। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে সব জাতিরই পূজার

অধিকার আছে এই দেবস্থানে—যা তোমাদের মন্দিরে হয়তো কেউ কখনো দেখনি।

পূজা দেখে ফিরছি, একটু দূরেই দেখি একটি ছোট খাট মন্দিরে রয়েছে হনুমানজীর মূর্তি। এমন সুন্দর জায়গায় উপাস্য দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠার লোভ সামলাতে না পেরে হয়তো কোন ধার্মিক মাড়োয়ারী এটি তৈরি করে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

হনুমানজীকে দর্শন করে নামতে সুরু করেছি হঠাৎ পিছনে দেখি দুর্জয়লিংগের পুরোহিত আসছেন ছুটে—ও বাঙালী বাবু, মহাগুরু মহাকাল ছে গুম্ফা ছে—বলতে বলতে। গেলুম তাঁর সংগে, কি আর করি বল? মহাকাল চূড়ার একটু নিচেই চার পাশে ছোট ছোট ঝোপজংগলের মধ্যে মহাকাল গুম্ফা—বেশ লম্বা এক সুড়ংগ এঁকে বেঁকে নামতে নামতে চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। মুখে তার সিঁদুর-মাখা ছোট্ট এক শিলালিংগ। এখানেও একটু পূজা করে ব্রাহ্মণকে দুচার পয়সা প্রণামী দিতে হল। ভাগ্যিস দাদা টর্চ-লাইটটা এনেছিলেন। তারই আলোয় সুড়ংগের ভেতর খানিকদূর ধাপে ধাপে নেমে পড়লুম। বুকের ভেতর দুর দুর করে উঠল। সে যে কি ভয়ানক অন্ধকার—যেন অনেকগুলো অমাবস্যার রাত্রি একজোট হয়ে চিরস্থায়ী

বাসা নিয়েছে এই গুহাটার মধ্যে। চারদিকে খালি পাথর আর পাথর। ওপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে সব জায়গাটাই বড় বড় পাথরে ঠাসা। তারই মধ্যে দিয়ে আব্‌রো খাব্‌রো সরু অন্ধকার গলি, যেন কোন পাতালপুরীর রাজকন্যার দেশে যাবার পথ। টর্চের আলো ফেলে কষ্টেসৃষ্টে পা টিপে টিপে এগুচ্ছি। মাথার ওপরের পাথরগুলো যেন সব শূন্যে ঝুলছে, প্রতিক্ষণেই মনে হচ্ছে এই ভেঙে পড়ল বুঝি! খানিকদূর নামতেই এল কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাপসা গন্ধ। গতিক ভাল নয় বুঝে দাদা পা চালালেন উল্টোদিকে কাজেই আমাদেরও বেরিয়ে পড়তে হল। পাণ্ডাঠাকুর বললেন—সুড়ংগটি চলে গেছে তিব্বতের রাজধানী লাসা অবধি, আবার কেউ বা বললে কুচবিহারের কালীবাড়ী পর্যন্ত। ওদের মতের মিলই হোক আর অমিলই হোক এটি যে বেশ লম্বা তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

মহাকাল গুম্ফা থেকে বেরিয়েই আবার সেই চৌরাস্তা। এখান থেকে বাঁদিকে নেমে গেছে রংগিত রোড। একটুখানি নামলেই এই রাস্তার ওপর স্টেপাসাইড ভবন। সে আবার কি বুঝলে না বুঝি? স্টেপাসাইড ভবন হচ্ছে দার্জিলিঙের বুকে একটি বাড়ী—যেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যান। এই তীর্থস্থানে খানিক দাঁড়িয়ে এখানকার ধূলি মাথায় নিয়ে

বাসায় যখন ফিরলুম বেলা তখন একটা। মায়েদের কাছে মাঝারিরকম কড়ামিঠে দুচারটে ধমক লাভ করে তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে খেয়ে নিলুম।

বিকেলে আর বেড়াতে পেলুম না—সকালেই নাকি দুবেলার বেড়ানো শেষ করে এসেছি।

ভুটিয়াবস্তি

এখানে তো রোজই রবিবার, তাই আজকের রবিবারটা এসেছে নতুনের আনন্দ না নিয়েই। মনটা ভারী ভারী বোধ হচ্ছে। চুপটি করে বসে আছি ওপাশের ঘরে, এমন সময় ওপর থেকে হুকুম এল হাটে যেতে হবে। দাদার হুকুম— না মেনে তো উপায় নেই, কে আবার চড়-চাপড়ের ঝড়-ঝাপটা সহ্য করবে? চললুম পাহাড়ী কেটাকে সংগে নিয়ে। মর্গান রোড থেকে একটু ওপরেই পোস্টঅফিসের সামনে প্রকাণ্ড খোলা জায়গায় হাট। পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ মিলে দোকান সাজিয়ে বসেছে নানান রকমের তরিতরকারী ফল-ফুলুরি মসলাপত্তর নিয়ে।

আলু পটোল মূলা বেগুন কপি মটর-শুঁটি সবই গাদা দিয়ে সাজানো হয়েছে রাস্তার দুপাশে। ওদিকে আবার ভুটিয়াদের মশলার দোকান। কোথাও কোন লেপচা পুরুষ মাথার চুলে চিরুণী গুঁজে বসেছে পিতল কাঁসার গেলাস বাটি আরও কত বাসনপত্তর বিক্রি করতে। মাঝে মাঝে আবার ঘি ধুপ ধুনো গুগ্‌গুলের দোকান। এখানেও বেশ ভিড় জমেছে। ভুটিয়া লেপচাদের বেশির ভাগই বৌদ্ধ। মন্দিরে জ্বালাতে হয় বলে ধুনোগুগ্‌গুলের ভারি আদর এখানে। চারদিকেই

হৈ হৈ চেঁচামেচি—মানে হট্টগোল যাকে বলে তাই আর কি। দোকানদাররা ঘণ্টা বাজিয়ে নানান স্বরে চীৎকার করে নিজেদের জিনিসের বড় বড় মৌখিক বিজ্ঞাপন দিয়ে খদ্দের ডাকছে। কোথাও বা দোকানদার আর খদ্দেরের মধ্যে দর-কষাকষি লেগে গেছে। দরে পোষাচ্ছে না বলে হাতের জিনিস ফেলে দিয়ে খদ্দের চলে যাচ্ছে দেখে বাবু আর একটা পয়সা দিয়—বলে দোকানদার তাকে ফিরিয়ে আনছে। এমনি গোলমালের মধ্যে কানে যদিও তালা লাগবার যোগাড়, তবু বেশ আনন্দই পাচ্ছি ঘুরে ঘুরে পাহাড়ীদের সংগে হাসিখুশির মধ্যে দিয়ে জিনিস কিনতে। খানিক পরে এসে পড়লুম মেছোবাজারে। বড় বড় টিনের শেডের নিচে মাছমাংসের বাজার। রুই কাতলা থেকে আরম্ভ করে কই মাগুর পর্যন্ত সব রকমের মাছই পাওয়া গেলেও দাম কিন্তু বড় বেশি। মাছের তুলনায় মাংস এখানে সস্তা। মাছ-মাংসের দোকানে কিন্তু একটাও মেয়ে-দোকানদার নেই। তবে এর সামনে তোমাদের ওখানকার নতুন বাজারের মত চমৎকার সাজানো ছোট্ট একটু ফলের বাজারের সব দোকানেই মেয়ে-দোকান-দার। এখানকার মেয়েরা এত পরিশ্রমী যে দেখলে অবাক হতে হয়। সংসারের কাজকর্ম সেরে দোকানের কেনাবেচা করতে করতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পশমের টুপি জামা

মোজা তৈরি করে সংসারের তুপয়সা সুসার করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে অনেকে আবার লেখাপড়া করে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটাই দিয়ে ফেলছে। কেউ বা সব কাজের ফাঁকে ঘণ্টা তুএক ছুটি করে ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুলে হাজরি দিয়ে তাঁতবোনা কার্পেট শতরঞ্চ তৈরি করাটাও নিচ্ছে শিখে। আশ্চর্য চেষ্টা এদের।

সমস্ত হাট ঘুরতে ঘুরতে বেশ বেলা হয়ে গেছে, এদিকে কেটা বলছে—বাবু, বাজারকা সমুচা চিজ মোলানেকে আপ মতলব কিয়া হ্যায়, চলিয়ে বাবু চলিয়ে, আউর কোই চিজকা জরুরত নেহি। চেয়ে দেখি পিঠের বোঝাটা তার নেহাৎ মন্দ হয়নি। কি আর করা যায়, বাড়ীর দিকেই ফিরতে হল—কেটার যা তাগিদ।

হাট থেকে বেরিয়ে একটুখানি এগিয়েছি, দেখি বাঁ হাতের আঙুল আর ডান হাতে পয়সা গুণে বিক্রি জিনিসের হিসেব করতে করতে গোলমাল করে চলে যাচ্ছে হাটের পসারিরা। ব্যাপারটা কি? এর মধ্যেই হাট ভাঙল যে? শুনতে শুনতে শোনা গেল আজ এখানে লাট সাহেব আসছেন। তাঁরই অভ্যর্থনার আয়োজন করা হবে হাটতলায়, হাট ভাঙল তাই সকাল সকাল। তাড়াতাড়ি বাসায় চললুম, নেয়ে খেয়ে আবার আসতে হবে তো।

বেলা একটার সময় গিয়ে দেখি হাটতলার চেহারাই গেছে বদলে। পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্‌ করছে সমস্ত জায়গাটা। ঢোকবার মুখে এভারগ্রীন মস্‌ ফুল লতাপাতা দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রকাণ্ড বড় তোরণ। দুপাশে তার সেপাই দাঁড়াবার জায়গা। মাঝখানে সোনার ঝালর-দেয়া সামিয়ানা টাঙানো, তার নিচে লাল ভলভেটের ওপর জড়োয়া কাজ-করা উঁচু চেয়ার—চেয়ার তো নয় সিংহাসন বলাই ভাল। দুপাশে আরও অনেকগুলি চেয়ার। সামনে জরীর ফুলকাটা লাল মখমলের টেবিলক্লথ-ঢাকা টেবিলে বড় বড় ফুলদানে ফুলের তোড়া। চারদিকে অগুণতি সিপাইসান্ত্রী পাহারাওয়ালা। তোপের আওয়াজের সংগে সংগে ব্যাণ্ড বাজতেই রাজমুকুটের চিহ্ন আঁকা প্রকাণ্ড বড় সাদা মোটরখানা ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল গুর্খা সৈন্য আর সার্জেণ্টদের ভিড়ের মাঝখানে। লাল মখমলের চাদর-বিছানো রাস্তা দিয়ে গিয়ে গভর্ণর বাহাদুর বসলেন সিংহাসনে। জনতা চীৎকার করে করলে বৃটিশরাজের জয় ঘোষণা। স্কুলের ছেলে মেয়েরা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে গড সেভ দি কিং গান করে লাট সাহেবকে অভিনন্দিত করলে। ছোটখাট একটু আধটু বক্তৃতার পর আরম্ভ হল সৈনিকদের প্যারেড। ব্যাণ্ড বাজনার তালে তালে যুদ্ধের কতরকম কৌশলই যে দেখালে তারা। কেমন করে শত্রুকে

আক্রমণ করে, কি করেই বা শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় সমস্তই সুন্দররূপে দেখালে বন্দুকধারী সৈন্যেরা নকল যুদ্ধের সৃষ্টি করে। চারদিকে হাততালি আর জয় জয়কার। খুব ভাল লাগল কিনা বুঝতে পারি নি, সমস্ত সময়টাই মনে হচ্ছিল মানুষ মানুষকে মারবার জন্যে কত কৌশলই না বের করেছে। সবশেষে বন্দনাগান গেয়ে সভা ভাঙল। গভর্ণর বাহাদুর দলবল নিয়ে ফিরলেন প্রাসাদে। দেখে শুনে আমরাও ফিরলুম বাসায়।

বেলা তখন পড়ন্ত। চুপি চুপি একলাটি বেরিয়ে পড়লুম সটান চৌরাস্তার দিকে। ওয়েস্টমল রোড ধরে চক্কর দিতে দিতে লাট সাহেবের বাড়ীর সামনে এসেছি সন্ধ্যে তখন হয় হয়। সূয্যিমামার চলার সাথে সাথে আশপাশের পাহাড়-গুলোর চোখ মুখ হয়ে গেছে কালিমাখা আর পশ্চিমের সিঁদুর-ছড়ানো আকাশের একফালি সরু সোনালী আলো এসে কাঞ্চনজংঘার কপালে দিয়েছে সোনার সিঁথি পরিয়ে। ঝাপসা কালো আকাশের বুকে হিমাচলের এ সোনার সাজ যেমন জমকাল তেমনি সুন্দর।

একটু ঘুরে রংগিত রোড ধরে নেমে চলেছি। দুপাশে ভুটিয়া লেপচাদের কুঁড়েগুলি গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে। দার্জিলিঙের ভুটিয়াবস্তি এটা। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে

গায়ে কাঠের দেয়ালে খড় গোলপাতা নয়তো অন্যরকমের ঘাসে ছাওয়া লেপচা ভুটিয়াদের ছোট ছোট নিচু ঘরগুলি। সামনে উঠোন নেই বললেই হয় আর ঘরের ভেতরটাও দরকারী অদরকারী হাজার রকমের জিনিসপত্রে ঠাসা। আশপাশে কত জঞ্জাল। সমস্তটায় মিলে ভারি বিশ্রী রকমের নোংরা এই ভুটিয়াবস্তিটা। এখানকার লোকগুলোও তেমনি। ছেলে মেয়ে সবাই ভারি নোংরা, অবশ্য এরা গরীবও সেই অনুপাতে। তাড়াতাড়ি এখানটা পার হয়ে গিয়ে পড়েছি একটা নিরিবিলি জায়গায়।
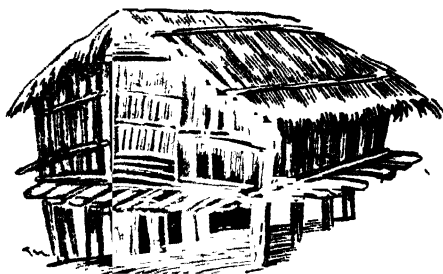
ছোট ছোট নিচু ঘর

দূরের পাহাড়গুলি তখন অন্ধকারের লেপ মুড়ি দিয়েছে, সোঁ সোঁ করে কন্‌কনে হাওয়া এসে বড় বড় ঝাউগাছের পাতায় পাতায় কাঁপন তুলেছে। পায়ের নিচে সরু রাস্তাটা পাহাড়ের মাঝে গিয়ে কোথায় গেছে হারিয়ে। এক মনে চলেছি তো চলেইছি। খেয়ালই নেই যে কতখানি এসে পড়েছি শহর থেকে। হঠাৎ মাংসপোড়ার বিশ্রী রকমের গন্ধ নাকে আসতেই গা-টা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। এ আবার কোথায়

এলুম? কেউ কোথাও নেই আর মাংসপোড়ার গন্ধই বা আসে কোত্থেকে? দেখতে দেখতে দেখি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তার নিচের থেকে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে আর চাপা গলার দুএকটি ফিস্‌ফাস কর্কশ স্বরও যেন শোনা যাচ্ছে। শেষে কি মানুষ-খেকো রাক্ষসদের হাতে পড়লুম নাকি? আমার মত একলা পথিক পেয়ে শিক-কাবাব বানিয়ে ওরা হয়তো সান্ধ্য ভোজের যোগাড় করবে। এগিয়ে যাব কি ফিরব ভাবছি এমন সময় আমার পাশেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল কালো রঙের ঢিলে পোশাক-পরা উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া-চুলো দুটো ভীষণ চেহারার লোক। বুকের মধ্যে তখন পড়ছে হাতুড়ির ঘা। লোক দুটো এদিকে হনহনিয়ে এগিয়ে এসে হাতমুখ নেড়ে কটর মটর করে যা বললে তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে না পারলেও বুঝলুম তারা রাক্ষস নয় ভুটিয়াবস্তিরই লোক। যাকৃগে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সাহস করে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—নিচের থেকে ধোঁয়া আসছে কিসের? আমি যতখানি বুঝেছিলুম ওদের কথা, আমার কথা ওরা বুঝলে ঠিক ততখানি। হাত মুখ নেড়ে কত কসরৎ করেও যখন সমান ফল হল তখন হাসির ধুম দেখে কে? সে ওরাও যত হাসে আমিও হাসি তত। হাসির প্রথম তোড়টা কেটে গেলে নিচের দিকে আঙুল দিয়ে

আমায় যেন কি একটা দেখিয়ে ওরা গেল চলে। আমিও চললুম আরও একটু নিচে। গিয়ে দেখি পথের বাঁকে মস্ত বড় একখানা পাথরের তলায় বসে জন চারেক ভুটিয়া আগুনে কি একটা পাখী পুড়িয়ে খুব মজা করে খাচ্ছে। আর তারই ধোঁয়া আর গন্ধে আমি চোখে দেখেছি সর্ষেফুল। হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে ওরা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। একজন তাড়াতাড়ি হাত তুলে সামনে দেখিয়ে দিল একটা বাড়ী। বুঝলুম ও আমাকে বলছে সেখানে যেতে। আচ্ছা দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি।

উতরাই পথ ধরে আরও খানিকটা নেমে চলেছি ওদের দেখানো বাড়ীটার দিকে। চারদিকে পাহাড়-ঘেরা বেশ বড় খানিকটা জায়গার মাঝে সেই বাড়ী। বাড়ী তো নয়—এ হচ্ছে ভুটিয়াবস্তির গোম্পা। গোম্পা কি বুঝলে না তো? এ তো আর মহাকালগুম্ফার মত পাহাড়ের গহ্বর নয়—গোম্পা হল এখানকার বৌদ্ধ মঠ। গোম্পার দরজার কাছে যেতেই এখানকার পুরোহিত একজন তিব্বতী লামা তাড়াতাড়ি এসে সংগে করে নিয়ে গিয়ে সব কিছু খুঁটিনাটি দেখালেন আমায়। তার সংগে কথার আদানপ্রদানটা যদিও হয়েছিল সীতা নাড়েন হাত আর বানরে নাড়ে মাথা অনুসারে, তবু তিনি যা দেখাচ্ছিলেন তার নামগুলো প্রায় সবই সংস্কৃত শব্দ আর

মাঝে মাঝে ছিল ছুচারটে ভাঙাচোরা হিন্দি বুকনি, কাজেই তার ভাবটা বুঝতে বিশেষ আটকায় নি। এই গোম্পা নাকি
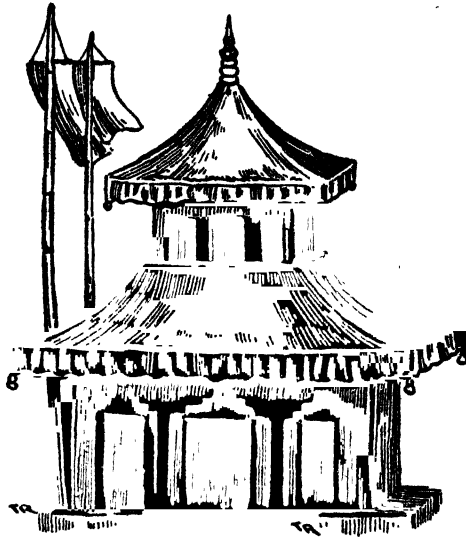
দোতলা করে তৈরি

আগে ছিল মহাকাল চূড়ায়। তারপর এখানে আনা হয়েছে ইংরেজদের আমলে। গোম্পাটি দোতলা তিব্বতী মন্দিরের মত তৈরি। নিচের তলায় তিব্বতী শিল্পীদের তৈরি মহাগুরু অমিতাভ বজ্রপাণি মহাকাল বিষ্ণু আর সহস্রবাহু লোকেশ্বরের মূর্তি। ভারি চমৎকার এই মূর্তিগুলি—বিশেষ করে অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তিটি কি যে পবিত্র ভাবের। মন্দিরের

ভেতর আর বাইরের দেয়ালে বড় বড় করে আঁকা সপ্তবুদ্ধ স্বর্গ ও নরকের নানান দৃশ্য। সবগুলিই তিব্বতী ধরণে আঁকা। বাইরের দিকে একফালি বারান্দা, একপাশে জয়ঢাকের মত প্রকাণ্ড একটা কি, গায়ে তার রং বেরঙের চিত্র করা—ঠিক যেন কতকগুলো অচেনা ভাষার অক্ষর লেখা। নেড়া-মাথা দাড়ি-ওয়ালা এক বুড়ো বসে বসে ঘোরাচ্ছেন সেটা। ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে আমার গাইড লামার মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন —তোমরা যেমন জপ কর রামনাম, তেমনি আমাদের জপের মন্ত্র হচ্ছে হুঁ মণি পদ্মে হুঁ।

বসে বসে ঘুরাচ্ছেন সেটা

ঢাকের গায়ে এই মন্ত্রটি লেখা আছে অনেকবার করে। একবার ঢাকটা ঘোরালে জপের ফললাভ হয় যতবার মন্ত্রটি লেখা আছে ততবার। বুঝলুম ঐ বুড়ো বসে বসে জপ করছেন।

নিচের তলা দেখা শেষ হলে লামা চললেন ওপরে।

মাঝখানে মহাগুরুর মূর্তি। মূর্তি কি ছবি তা বোঝবার উপায় নেই, এমনি চমৎকার করেছে এরা। যেমন প্যাঁচকাটা হাল্কা মেঘ লতা পাতা ফুল ফল আঁকা থাকে তিব্বতী ছবিতে, মাটি দিয়ে এরা করেছে ঠিক তেমনি হাল্কা মেঘ তেমনি লতাপাতা ফুল, আবার রংও করেছে ঠিক তেমনি ঝকঝকে। সত্যি মাটির কাজে চমৎকার হাত এদের।

মহাগুরুর মূর্তির পাশেই দেখি পাথরের এক কালীমূর্তি। ইনি যে কি করে এলেন এখানে তা বুঝলুম না। কত পুরোনো তিব্বতী পট রয়েছে এখানে, আর আছে বড় বড় আকারের অনেকগুলি হাতের লেখা পুঁথি। লামা বললেন তাঁদের ধর্মের দুখানি বিশ্বকোষ, নাম ট্যাংগুর আর ক্যাংগুর। ওদের এক একখানায় আবার ১০৮টি করে ভাগ। এরই কতকগুলি রাখা হয়েছে এখানে। মহাগুরুর মূর্তির মত এই পুঁথিগুলিও এঁদের কাছে পরম পবিত্র, তাই মূর্তির মত পূজা পাবার জন্যেই এগুলি স্থান পেয়েছে মঠে।

নিচে নেমে আসতে সন্ধ্যে গেল উৎরে। শহরের গোলমাল থেকে দূরে নির্জন জায়গায় জাঁকজমকহীন শান্ত মন্দির, আর তার ভিতরের শান্তিদাতা বুদ্ধের শান্ত শ্রী ভারি ভাল লাগল। আর ভাল লাগল এই শান্ত লামাকে। কি সহজ সরল অমায়িক ব্যবহার এঁদের।

সন্ধ্যের পরে দুজন ভুটিয়া মন্দিরের দামামায় ঘা দিলে। তার গুরুগম্ভীর আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠল পাহাড়ের মাথায় মাথায়। মোটা মোটা গয়না-পরা দুচারজন পাহাড়ী বউ বস্তি থেকে এসে মূর্তির সামনে জ্বাললে ঘিএর প্রদীপ আর ধুপ, তারপর প্রণাম করে নীরবে গেল চলে।

লামার কাছে বিদায় নিয়ে আমিও চললুম বাসার দিকে। ফিরে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড—বিকেল থেকে আমাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,কোথায় হারিয়ে গেছি কে জানে।

বার্চহিলের পথে

তখন সবে ছুটো, দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম পথে। দুপুরের রোদ্দুরে বেড়ানোর জন্যে বকুনির ভয় তো নেই, এখানে যে সর্ব্বদাই শীত।

লয়েড রোড ধরে যাচ্ছি চৌরাস্তায়, যেতে যেতে এসে পড়লুম ওয়েস্টমল রোডে। একটু এগিয়ে ডাইনে দেখি সুন্দর এক ছোট খাট গির্জা, নাম এর সেণ্ট এণ্ড্রুজ চার্চ। প্রতি রবিবার সকালে ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ ওঠে, অমনি দলে দলে ভক্ত খ্রীস্টানরা আসেন এখানে উপাসনার জন্যে। গির্জার সামনে মাঝারি রকমের একটি বাগান। ভারি সুন্দর বাগান এটি, দুর্বাশ্যামল মাঠের চারদিকে সবুজ রঙের রেলিঙ্, রেলিঙের ধারে ধারে নানান রকমের ফুলের কেয়ারি। মাঝে মাঝে জমকালো রঙের সিজন ফ্লাওয়ার থরে থরে ফুটে সারা মাঠটিতে বর্ডার-দেয়া সবুজ ভেলভেটের ফুলদার জাজিমের বাহার তুলেছে। বাগানটির নাম হচ্ছে চিল্‌ড্রেন্‌স্ পার্ক। নাম শুনেই বুঝতে পারছ তোমার মত দুষ্টুদের মেলা এখানে। কত রকমের পোশাক পরে সেজেগুজে বড় ছোট আরও ছোট খোকা খুকুরা আসে পড়ন্ত বেলায়। রঙে রঙে আড়াআড়ি করে হেলে দুলে ছুটে চলে খুকুমণিরা

প্রজাপতির সংগে পাল্লা দিয়ে। কত দুষ্টু কত চপল খোকন-মণিরা আছাড় খেতে খেতে ছুটে চলে মার্বেল না হয় বলের পেছনে। কত শান্ত কত শিষ্ট খোকাখুকুরা ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে খেলে, না হয় করে কত গল্প। হাসি-হুল্লোড় চেঁচামেচিতে তখন যেন আনন্দের হাট বসে এই পার্কে। বাঙালীরা এর নাম দিয়েছে নন্দনকানন। সত্যিকারের নন্দন-কাননে দেবশিশুরা খেলে কিনা জানি না, কিন্তু শিশু-দেবতাদের মেলায় সত্যিই এর নাম হয়ে ওঠে সার্থক।

পার্ক থেকে বেরিয়ে একটু নিচেই যাদুঘর। এত কাছাকাছি যখন, না দেখে কি ফেরা যায়, বল তো? সবাই মিলে গেলুম যাদুঘর দেখতে।

কলকাতার মত বড় তো নয়ই বরং খুব ছোট, মাত্র একটা বড় হলেই শেষ হয়েছে এই মিউজিয়ম। তা হলেও বেশ লাগল এটি। এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস এমন স্থন্দর করে সাজানো যে তারা যেন জোর করে দৃষ্টিটুকুকে টেনে নেয়। কত জীবজন্তু হরেক রকমের পার্বত্য পাখী হরিণ বনবেড়ালের মৃতদেহ সাজিয়ে রাখা আছে—তাদের থাকবার জায়গার দৃশ্য, খাবার জিনিস, কাচ্চাবাচ্চা ঘর গেরস্থালী সব সমেত। দেখলেই মনে হয় যেন সব সত্যি সব জীবন্ত, আর সংগে সংগে এদের জীবনযাত্রার প্রণালীটি জানা হয়ে

যায় মোটামুটি রকমের। আর একটি ভারি সুন্দর জিনিস আছে এখানে, যা তোমাদের ওখানে নেই। এখানে আছে হিমালয়ের ছ শ রকমের সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি—যেমন সৌষ্ঠব তেমনি আকার তাদের। আধ ইঞ্চি হতে আরম্ভ করে আধ হাত পর্যন্ত মাপ এদের।

মাটির তৈরি এভারেস্ট অভিযানের সুন্দর এক নক্সা রয়েছে এখানে।

যাদুঘর থেকে বেরিয়েছি, সূয্যিমামা নেমে পড়েছে পশ্চিম দিকের পাহাড়টির আড়ালে। ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া বইছে শির্‌শির্‌ করে, বাড়ী ফিরি কি না ফিরি করতে করতে এসে পড়লুম লাটভবনের সামনে। ভেতরে ঢোকবার হুকুম নেই—স্বয়ং গভর্নর বাহাদুর এসে বাস করছেন স্রাবেরী প্যালেসে। এখন গ্রীষ্মকাল কিনা, আর বাংলার গভর্নরের গ্রীষ্মাবাসই হল দার্জিলিং।

লাটভবনের সামনে থেকে চলে গেছে ওয়েস্ট বার্চহিল রোড। চলতে চলতে চলেছি তো চলেইছি ঐ পথ ধরে, বাড়ী ফেরার কথা কখন ভুলে গেছি কে জানে। সামনে দেখি বড় বড় ঝাউগাছের ফাঁকে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে বিরাট প্রাসাদের আঙিনায় বই হাতে ইউরোপীয় ছেলে মেয়েরা কতরকম গল্পসল্প, আলাপ-আলোচনা করছে। প্রাসাদটি সেণ্ট যোসেফ কলেজ।

আমেরিকান টাকায় তৈরি এই কলেজটি আর এর পরিচালক হচ্ছেন জেস্যুইট শ্রেণীর রোমান ক্যাথলিক পাদরীরা।

কলেজের পরেই রাস্তাটি গেছে সরু হয়ে, সংগে সংগে দুপাশের ঝাউগাছগুলোও যেন হঠাৎ গেছে বুড়ো হয়ে। উঁচু মাথা আরও উঁচু করে হাড়-জিরজিরে শরীর নিয়ে কোন রকমে যেন এরা রাস্তার খবরদারি করছে। এই সব বুড়ো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এঁকে বেঁকে চলা পথে চলতে চলতে এসে পড়লুম বার্চহিল বাগানে। বাগান বলতে যে ফুলগাছের ছড়াছড়ি তা নেই এখানে। দু-চারটে সিজন ফ্লাওয়ারের কেয়ারি, আর এখানে ওখানে খুব যত্ন করে রাখা হয়েছে হিমালয়ের সেই পুরোনো কালের নানান জাতের বড় বড় গাছ আর নানান রকম লতাকুঞ্জ। এই সব কুঞ্জের মাঝে মাঝে বসবার জন্যে বেঞ্চ পাতা, কোথাও কোথাও আবার চড়ুইভাতির জন্যে বড়সড় একটুখানি জায়গা। কোন কোন লম্বা গাছে তোমার লোভ-লাগানো দোলনা টাঙানো। বার্চহিল হচ্ছে দার্জিলিঙের উত্তরদিকের শেষ, তাই এখানটা থাকে বেশ নির্জন। এর জন্যে অনেকে আসেন এখানে চড়ুইভাতি করতে না হয় দোলনায় দোল খেতে। এখান থেকে চারদিকে দেখা যায় খালি পাহাড়ের পর পাহাড় আর তাদের বিচিত্র দৃশ্য—যেমন সুন্দর তেমনি চমৎকার।

নন্দন-কাননের খোকাখুকু, যাতুঘরের মরা জানোয়ার আর বার্চহিলের দোলনা—সব মিলিয়ে আজকের বেড়ানোটা হল বড় চমৎকার, শুধু পা-বেচারাদেরই যা বিপদ। আর তো পারে না ওরা। শহরের বাইরে বলে এখানটায়
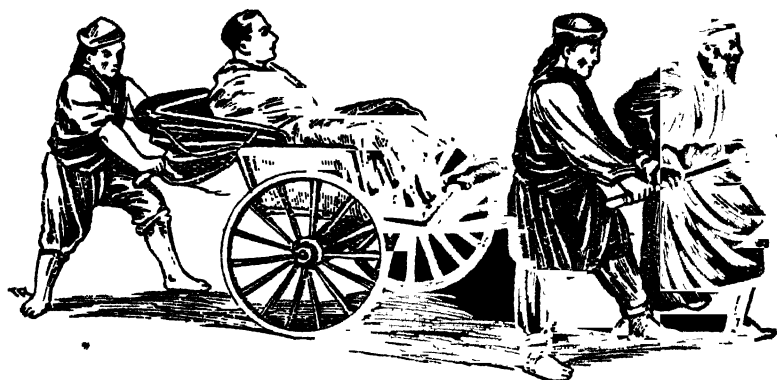
লোক লাগে তিনজন

আবার রিক্সা কি ঘোড়া কিছুই পাওয়া যায় না। তোমাদের ওখানে তো ঠুং ঠুং ঘণ্টা বাজিয়ে একজন লোকেই ছুটে চলে রিক্সা টেনে নিয়ে। এখানে কিন্তু রিক্সা টানতে লোক লাগে তিনজন—দুজন টানে সামনে আর একজন ঠেলা দেয় পেছনে। সব সময়েই তো ওপরে ওঠা, নয় নিচে নামা, কাজেই তিনজনের কম পেরে ওঠে না এরা।

আর একটা যানও ভাড়া মেলে এখানে, নাম তার ডাণ্ডি। চারজন লোকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়

এটাকে—এই কতকটা তোমাদের ছাদ-খোলা পাল্কির মত আর কি।

ছাদখোলা পাল্কির মত

রিক্সা ডাণ্ডি ঘোড়া কোনটাই জুটল না, কাজেই কোন রকমে টেনে টেনে চললুম ফিরতি পথে।

সূয্যিমামার আর দেখা নেই—মেঘমালার লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন পাহাড়-ঘেরা ঘরে। একটা আধ-আঁধারি আধ-আলো চারদিকের পার্বত্য দৃশ্যটিকে লেপেমুছে একাকার করে দিয়েছে, পথ-চলা লোক কমে এসেছে, আমরা কজন ফিরছি তখন হুকার রোড ধরে।

গাছেদের কাঁচা পাতা নড়ে না, পাকা পাতা পড়ে না,

নীরব নিস্তব্ধ চারদিক। সাঁঝের আঁধার আরও বাড়িয়ে তুলেছে এই স্তব্ধতাকে। ডাইনে ইউরোপীয় কবরখানা আরও নীরব আরও শান্ত। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে মার্বেল পাথরের সমাধি-স্তম্ভগুলি শাদা কাপড়পরা বিধবার মত করুণ চোখে চেয়ে আছে আকাশপানে—যেন তার কোলে শোয়া ঘুমন্ত শিশুটির জন্যে বলছে কিছু বিশ্বদেবতার পায়ে। তাদের গায়ের লেখাগুলি আবার এত করুণ যেন তারা মরম ছুঁয়ে চোখে দেয় জলের বান বইয়ে। কত মা রেখে গেছেন বুকের মানিকদের মাটির বিছানায় শুইয়ে। কত ভাই-বোন খেলার সাথী কচি কচি ভাই-বোনদের ছেড়ে গেছে এখানে। একটি সমাধি-পাথরের গায়ে লেখা—মানিক আমার, হিয়ার মানিক, আর একটিতে—হ্যারি আমার ভাইটি, একটি চুমু তোমার জন্যে। একটি সমাধি একজন অষ্ট্রীয় পণ্ডিতের—নাম তাঁর ভাস্কো-ডি-করো। তাঁর বিশ্বাস ছিল অষ্ট্রীয় জাতি তে [illegible] জ্ঞাতি। তিব্বতের এক গোম্পায় তিন চার বছর ধরে নানা শাস্ত্র পড়ে অনেক পুঁথিপত্তর নিয়ে তিনি ফিরে যান দেশে। তারপর আবার তিব্বত যাবার জন্যে আসেন দার্জিলিং। কিন্তু তিব্বত আর যাওয়া হল না, সব চলার শেষ হল তাঁর এখানেই। জোর করে বলতে পারি এখানে এলে না কেঁদে থাকতে পারতে না তুমি।

সোজা চলেছি কার্ট রোড ধরে। যেতে যেতে প্রায় বাজারের কাছে আসতেই বাঁ দিকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল। কত গরীব রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে এখানে বিনা পয়সায়। বাজারের ঠিক ওপরেই বেশ উঁচু জায়গায় ইডেন সেনিটরিয়ম। সে কি বুঝলে না বুঝি? ইডেন সেনিটরিয়ম হল সাহেবদের স্বাস্থ্যনিবাস। স্বাস্থ্য লাভের আশায় যে সব ইউরোপীয় আসেন দার্জিলিঙে তাঁদের অনেকেই থাকেন এখানে। তার জন্যে রীতিমত টাকা দিতে হয় নিশ্চয়ই।

এতক্ষণে আমরা এসে পড়েছি বাজারের কাছাকাছি। তরকারি-বাজার মাছের বাজার মাংসের বাজার সব ছাড়িয়ে ডানদিকে শুনি হৈ হৈ গোলমাল। হাটের বাইরে হট্টগোল? কি না কি—দেখতে দেখতে দেখি হিন্দু পাবলিক হলে বেজায় ভিড়। এখানে নাকি থিয়েটার হচ্ছে। সামনেই চাঁদমারি। এই চাঁদমারিই হচ্ছে দার্জিলিঙের বাঙালী-পাড়া। কত বাঙালী রয়েছেন এখানে—কেউ এসেছেন বেড়াতে, কেউবা ঘরবাড়ী তৈরি করে হয়ে গেছেন এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। হিন্দু পাবলিক হল এঁদেরই একটা বড় আড্ডা। থিয়েটার বায়স্কোপ হরিবাসর কথকতা—এইসব যা কিছু হিন্দুদের ব্যাপার সবই হয় এখানে। তাছাড়া এর সংগে আছে একটা

ছোট লাইব্রেরী। কাজেই প্রায় রোজই অনেক বাঙালী জড়ো হন এই হলে।

বাসা খুব কাছেই। মিনকুদের আর সবুর সয় না, একছুটেই তো বাসার ভেতর। তারপর সে কি হাসির ধুম—হাসতে হাসতে পেট ফাটে আর কি। এখানে তো আর বাঙালী চাকর মেলে না, সব পাহাড়ী। আমাদের হরগোবিন্দটা ছিল একেবারে খাস নেপালের নতুন আমদানী। না বুঝত সে বাংলা না হিন্দি। একে তো দার্জিলিঙের কন্‌কনে শীত, তার ওপরে এখানকার জল তো নয় যেন বরফ। আর হরগোবিন্দটা করেছে কি—ঘরের মেঝে ধুচ্ছে বালতি বালতি জল ঢেলে। বিশুদ্ধ হিন্দিতে কাকীমা বলছেন—আরে এতনা পানি কেন দিচ্ছ থোড়া থোড়া পানি দিতে পার না? কাকীমার মুখপানে হাঁ করে চেয়ে সে জল ঢালছে যত বেশি, কাকীমার রাগও যাচ্ছে ততই বেড়ে। আর তাঁর মুখ থেকে হিন্দি-সরস্বতী তখন অনর্গল বেরুচ্ছেন এলোপাথাড়ি চরণ ফেলে। বাজী রেখে বলতে পারি হাসতে হাসতে কুমড়ো-গড়াগড়ি হতে তুমি।

তামাং গোম্পা

পাখ-পাখালি ওঠে নি, ঘুমের ঘোর কাটে নি, কানে ভেসে এল রোশনচৌকির মন-মাতানো সুর, তার সংগে কান-ফাটানো শাঁখের আওয়াজ। এ আবার কি? এই পাহাড়ে দেশে এসে আবার বাঙালী বাবুদের বিয়ের সাধ হল নাকি? চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে দেখি রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত চলেছে বিরাট এক শোভাযাত্রা। কিসের? না—নেপালী বৌদ্ধদের শব নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্মশানে, তাই এই ঘটা। শাদা কাপড়ে ঢাকা সুন্দর শবাধার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শাদা পোশাক-পরা আটজন লোক। শবাধারের সামনে হলদে পোশাক-পরা লামা চলেছেন খাপ-খোলা তলোয়ার হাতে, দুপাশে তাঁর মন্ত্র লেখা পতাকা হাতে দুজন ভিক্ষু। তাঁদের আগে দুজন চলেছেন শাঁখ বাজিয়ে। নানান রকমের পোশাক-পরা কত লোক যাচ্ছে শবের পিছনে পিছনে।

দেখতে দেখতে শোভাযাত্রা এসে পড়ল আমাদের বাসার কাছেই। পাশেই যে তামাং গোম্পা তা তো শোন নি। তামাং গোম্পা হল ভুটিয়াবস্তির গোম্পার মতই একটি ছোট-খাট বৌদ্ধ মন্দির। শোভাযাত্রা এসে পৌঁছল এই গোম্পায়।

তারপর শবকে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়ে মন্দিরের সামনে শবাধার নামানো হল। লামা কত মন্ত্রতন্ত্র পড়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেন। কতক্ষণ পরে শোভাযাত্রা ধরল শ্মশানের পথ। শবদেহটা দাহ করে তার ওপরে এখানকার বৌদ্ধরা তৈরি করে তিব্বতী ধরণে সমাধি-মন্দির—দেখতে অনেকটা বৌদ্ধ-স্তূপের মত।
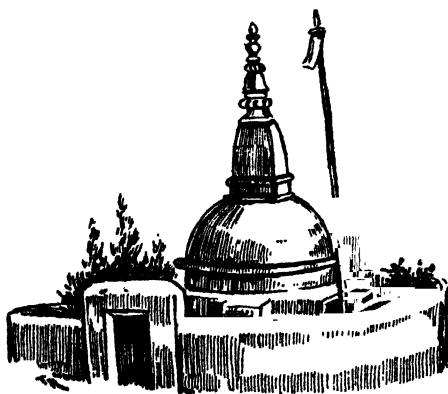
দেখতে অনেকটা বৌদ্ধ-স্তূপের মত

মন্দির তখনও খোলা, ভেতরটা দেখে নিলুম সেই সুযোগে। গোম্পাটি প্রায় ভুটিয়াবস্তির মতই। নিচের তলায় মহাগুরু বিষ্ণু বুদ্ধ মহাকাল ও কালভৈরবের সুন্দর সুন্দর মূর্তি আর দোতলায় রয়েছে তিনটি আলাদা বুদ্ধমূর্তি আর সুন্দর ছোট একটি তারামূর্তি।

এতক্ষণ ভিড় হয়তো কমেছে। নেমে দেখি কমা তো দূরের কথা, ভিড় গেছে বেজায় বেড়ে। আজ যে বৈশাখী পূর্ণিমা। ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি বলে বৌদ্ধদের ভারি পবিত্র দিন এটি। একটু বেলা হতেই একে একে দুয়ে দুয়ে কত যে ভক্ত আসতে আরম্ভ করলে। নটা বাজতে না বাজতে মন্দির থেকে সুরু করে চারদিকে রাস্তায় হয়ে গেল লোকে লোকারণ্য। কোনো রকমে গুঁতোগুঁতি করে একটু জায়গা করে নিলুম পূজা দেখতে।

জয়ঢাক জগঝম্পে ঘা পড়ে, গুরুগম্ভীর আওয়াজ তাদের জানিয়ে দেয় পূজার সময় কাছে। বড় বড় করতাল তালে তালে বেজে ওঠে ঝনন্ ঝন্। মূর্তির সামনে সাজানো হয় নৈবেদ্য, আশেপাশে অগুন্‌তি ঘিএর প্রদীপ। ধুপ-ধুনো ফলফুলের গন্ধে মন্দির মশগুল। পূজা আরম্ভ হয়। প্রধান পুরোহিত উঁচু আসনে বসে মন্ত্র পড়তে থাকেন অনর্গল। এদের নৈবেদ্য সাজানো কিন্তু তোমাদের থেকে একেবারে আলাদা। তোমাদের মত ফলমূল কেটে নৈবেদ্য সাজান না এঁরা। আস্ত ফল আর মিষ্টি সাজিয়ে দেয়া হয় বড় বড় পাত্রে, তারপর পূজা শেষে দরকার মত কেটে কেটে প্রসাদ দেয়া হয় সকলকে। তা কি করবে বল? পূজা আরম্ভ হয় বেলা নটায় আর শেষ হয় সাড়ে-তিনটে থেকে
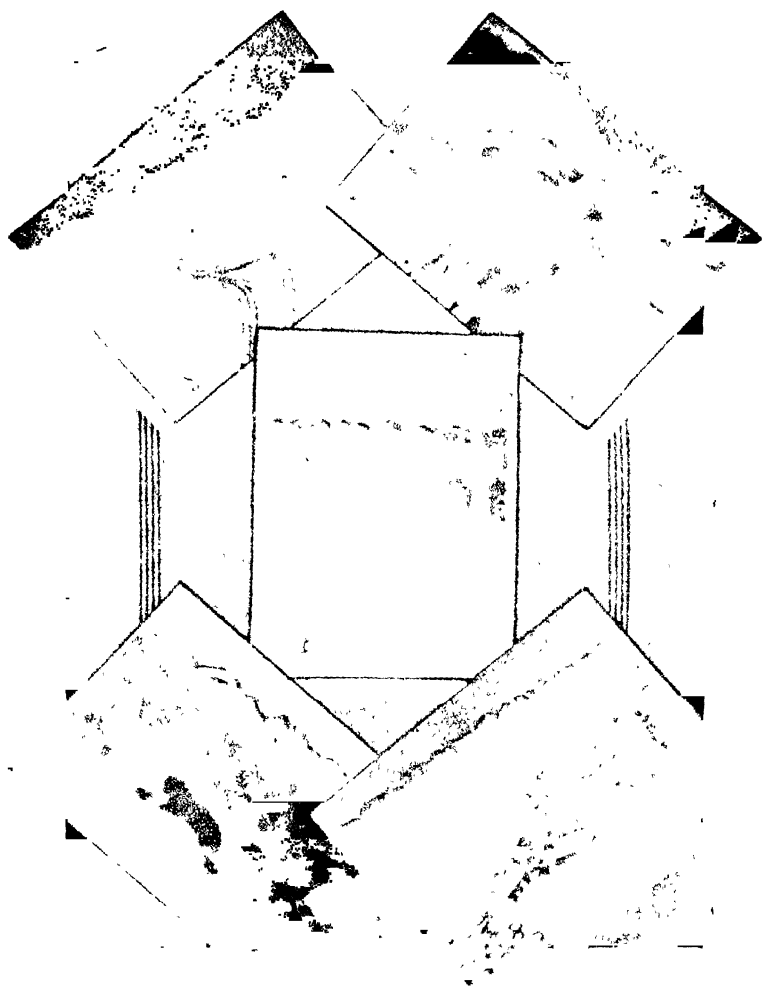
১। একটা মজার বাঁক। ২। হাটের বাইরে হট্টগোল।

৩। পেঁজা তুলোর মত মেঘ জড়ানো। ৪। থাকে থাকে বাড়ী।

৫। রূপোর মত ঝকঝক করছে।

চারটের মধ্যে। এতক্ষণ ধরে মাছির প্রসাদ হওয়ার চেয়ে এদের ব্যবস্থা অনেক ভাল, কি বল ?

পূজা এখন হতে থাক, প্রসাদ লোকে পেতে থাক, আমরা কিন্তু ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে পড়ছি রাস্তায়। ভিক্টোরিয়া রোড ধরে যাচ্ছি উত্তর মুখে, যেতে যেতে খানিক পরেই চললুম একেবারে পাতালমুখো। মিনিট পাঁচেক পরেই এলুম ভারি চমৎকার একটা জায়গায়। জায়গাটা কোথা জান ? এখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেন। বাঙালী-পাড়া চাঁদমারির ঠিক নিচেই পাহাড়ের ঢালু গায়ে সাজানো এই বাগানটি। কতকগুলো 'দ' আকারের রাস্তা এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে অনেকখানি নিচে অবধি, এই রাস্তাগুলোর দুপাশে থরে থরে সাজানো পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে আনা হাজারো রকমের ফুলগাছ—হরেক রকমের উদ্ভিদ্। হিমালয়ের এই অঞ্চলে কি রকমের গাছ-পালা ভাল জন্মাবে তারই পরখ করা হয় এই বাগানের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে। বাগান-টির ব্যবস্থাও ভারি চমৎকার। আদুরে খুকুমণিদের মত যে সব গাছগুলো ভারি সুখী, রোদ্দুরে যাদের মাথা ধরে, শিশিরে যাদের সর্দি করে, তাদেরকে রাখা হয়েছে দুটো প্রকাণ্ড কাঁচের ঘরে চমৎকার করে সাজিয়ে। এই কটা দিন আবার এখানকার বসন্তকাল, মানে—বৈশাখ মাসের শেষ

পনরটা দিন আর কি। তাই ফুলও ফুটেছে অজস্র। আর তাদের রঙের কথা? মন-ভোলানো, চোখ-রঙানো, যত রকমের রং চাও বা না চাও সবই আছে এদের মধ্যে। কতকগুলো ফুলের আবার এমন গড়ন, মনে হচ্ছে যেন এক একটা প্রজাপতি ডানা মেলে বসে রয়েছে ফুলের ওপর।

চারদিকে সুনীল পাহাড় আর মাঝখানে রঙিন ফুলে-ভরা এই বাগান সত্যিই সুন্দর।

আর এই সুন্দর জায়গাটার নিচেই কি জান? আলোর নিচেই অন্ধকারের মত এই বাগানের নিচে চুরি ডাকাতি খুন জখম নানান রকম কুকাজ অকাজ করে যাদের সাজা হয়েছে তাদেরই আস্তানা, মানে—দার্জিলিঙের জেলখানা।

না না, ফাঁকি দিই নি, বিকেলের বেড়ানোর কথা বলছি।

খাওয়া-দাওয়ার পর জামাজোড়া পরে বেরিয়েছি। আজ আর কোন দিকে না, সোজা চলেছি তামাং গোম্পার পাশ দিয়ে ভিক্টোরিয়া রোড ধরে। এ রাস্তাটা যেন দার্জিলিং পাহাড়ের কোমরবন্ধ। এঁকে বেঁকে সামনে খানিকটা যেতেই বাঁদিকে একটু ওপরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, আর তার গায়েই দার্জিলিং হাই স্কুল। রামকৃষ্ণ-আশ্রমে অনেকগুলি সন্ন্যাসী থাকেন শিক্ষা আর ধর্ম প্রচার করতে।

আশ্রমে হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় পাঠশালা আর মন্দির আছে। লেপচা ভুটিয়া নেপালী চাষা ধোপা মেথর হিন্দু খ্রীস্টান বৌদ্ধ সব জাতিরই ছেলেরা পড়তে পারে এই আশ্রমের পাঠশালায়। ইংরাজী বাংলা হিন্দির সাথে সাথে নেপালী ভাষায় প্রথম পড়াও শেখান হয় এখানে।

এর পরেই ভিক্টোরিয়া রোড থেকে ডান দিকে নিচে নেমে গেছে এক রাস্তা পাহাড়ের পায়ের দিকে শ্মশানে। শেষের রাস্তা, তাই বাকি রইল শেষের জন্যে।

এঁকে বেঁকে চলেছি ভিক্টোরিয়া রোড ধরে, কানে এল ভারি মিষ্টি রকমের আওয়াজ—ঝিরি ঝিরি, ঝুরু ঝুরু। মোড় ঘুরতেই সামনে এক ছোট সুন্দর পুল আর তার পাশেই খাড়া পাহাড় হতে ঝরছে ছোট এক ঝরণা। এর নাম ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌—মানে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আর কি। এটি লাফ মেরেছে প্রায় একশ ফুট খাড়াই পাহাড়ের মাথা থেকে।

এখন ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌ চওড়ায় মাত্র ফুটখানেক। বর্ষাকালে উগ্রমূর্তি ধরে পাহাড় ধ্বসিয়ে দিত বলে এর দশা হয়েছে পাগলাঝোরার মতই। তাই এর তেজও গেছে কমে। সামনে উঁচু কালো পাহাড়, গায়ে তার মাঝে মাঝে সবুজ শেওলা, কোথাও বা দুচারটে ফার্ন্‌ গাছ। পায়ের কাছে হাজার হাজার ছোট বড় নুড়ি গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে

ছড়ানো, এপাশে ওপাশে চামর-দুলানো ঝাউগাছ, তারই মাঝখানে হীরে-গালানো ঝর্ণাধারা হাজার মাণিক ছড়াতে ছড়াতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে চলেছে নেচে-চলা খুকুমণির মত শিলা হতে শিলার ওপর।

ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌-এর ওপর দিকে কার্ট রোডের নিচে খানিকটা জল জমে হয়েছে ছোট একটা ডোবার মত, এখান-টাকে বলে কাকঝোরা। পর্বতরাজ হিমালয়ের মেয়ে পার্বতী নাকি স্নান করতেন এখানে। সত্যি মিথ্যে কে জানে, তবে দার্জিলিঙের বাঙালীপাড়ার দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন হয় এইখানেই। তাহলে কথাটা সত্যি বলাই ভাল—কি বল ?

ঝরণার শোভা দেখে পুল পেরিয়ে খানিকটা যেতেই দেখি ডান দিকে একটা পথ হেঁটমুখে চলে গেছে একেবারে পাহাড়ের পা-তলায়। এই রাস্তায় পাঁচ হাজার ফুট নেমে গেলে বিজলীর কারখানা। এখানে কি করে বিজলী তৈরি হচ্ছে জান ? পাহাড়ের গা থেকে যে সব ঝরণা নেমেছে এই পথে, তাদেরই স্রোতের শক্তি থেকে বের করা হচ্ছে তড়িৎ। এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ইউরোপের লোক। কখন কখন বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারও চালান এই কারখানা। একে তো মাইল পাঁচ লম্বা তার ওপরে আবার এত বিশ্রী এই পথটা যে শুনেই কারখানা দেখার আশা ছাড়তে হল।

ভিক্টোরিয়া রোড এইবার আস্তে আস্তে উঠেছে স্বর্গ-পানে। সামনে দেখি ফুলবাগিচা আর ঝাউগাছে ঘেরা অনেকখানি জায়গার মধ্যে বিরাট এক প্রাসাদ আর সুন্দর সুন্দর কয়েকটি দেবমন্দির। বর্ধমানের রাজবাড়ী এটি। মন্দির বাগান প্রাসাদ সবে মিলিয়ে বেশ সুন্দর দেখবার মত জায়গা।

দার্জিলিঙের এদিকটা আজ সারা হল, পা-দুটোও আর চলতে নারাজ। কাজেই সবাই এখন ফিরতিমুখো।

জলাপাহাড়ে

রবিবারের দুপুরটা ভারি মিষ্টি। শিরশিরে হাওয়া ঝির্‌-ঝির্‌ করে পাহাড়ের গায়ে-জড়ানো মেঘগুলোকে ঠেলে ঠেলে সাফ করে ফেলছে। ধণ্টু মণ্টুর দুষ্টুমির আসর তখনও জাঁকে নি। দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছে লেপমুড়ি দিয়ে। একা—এক্কেবারে একা বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। মতলব—জলাপাহাড় যাওয়া। তা কি করব বল? ওরা তো আর উঠতে পারবে না ঐ উঁচুতে, কাজেই একা না পালালে ওখানকার কথা থেকে যাবে তোমার জানার বাইরে।

বাজার থেকে লয়েড় রোড ধরে কমার্শিয়াল রো দিয়ে যাচ্ছি দক্ষিণমুখো। একটু আগেই অকল্যাণ্ড রোড চলেছে মাথা উঁচু করে মহাপ্রস্থানের পথে। খানিকটা যেতেই মেমোরিয়্যাল গির্জা। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর গির্জা এটি। সামনে একটুখানি ফুলের বাগান, দুর্বাঘাসের সবুজ গালিচা-পাতা মাঠের ধারে ধারে চুনী পান্নাকে হার-মানানো নানান রঙের সীজন ফ্লাওয়ারের পাড়। দুপাশে সোনার রঙের সূর্যমুখী ফুল হাজারে হাজারে নিমেষহারা চোখে চেয়ে আছে সূর্য্যিঠাকুরের পানে। ফুলগাছের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর পোশাক-পরা মেমসাহেবরা ধীরে ধীরে যাচ্ছেন গির্জার দিকে

—বুকে তাঁদের ভক্তি ভরা, মুখে মাখানো পবিত্রতা। গির্জা ছাড়িয়ে আর একটু দক্ষিণে দার্জিলিঙের সব চাইতে বড় হোটেল 'এভারেস্ট'-এর মস্ত বড় সাজানো গোছানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী। দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক দার্জিলিং বেড়াতে এসে আস্তানা নিয়েছেন এখানে। হোটেলের দক্ষিণে খুব চড়াই এক রাস্তা ধরে যেতেই পড়লুম নবাব আলী চৌধুরীর প্রাসাদের সামনে। নবাব সাহেবের প্রাসাদ, বড় তো হবেই। প্রাসাদের ভেতরই নাচ-গানের মস্ত বড় স্টেজ, খেলার মাঠ, সুন্দর ছোট এক মসজিদ, আর বসোরাই গুলাবের ছড়াছড়ি। দার্জিলিঙে এই প্রথম গোলাপ ফুল দেখলুম যার কিছু গন্ধ আছে।

জলাপাহাড় রোড ধরে যাচ্ছি, ডানদিকে দিঘাপাতিয়ার রাজবাড়ী গিরিবিলাস নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে দেবদারু-গাছের আড়ালে। পাশেই সেন্ট পল স্কুল। একটু নিচে পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে ফুলের কেয়ারি, ছোট ছোট কাঁচের ঘরে কত রকমের গাছপালা। এ আবার আর একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন নাকি? না না, এ হচ্ছে মায়াপুরী রিসার্চ্চ এ্যাসোসিয়েশন—আচার্য্য জগদীশ বসুর ল্যাবরেটরী, আর তারই সংগে তাঁর বাগান। বিজ্ঞানের আলোচনার জন্যে কত রকমের গাছপালা যত্ন করে রাখা হয়েছে এই বাগানে।

বাইরের ঘরে বসে আচার্য্যদেব তখন বই পড়ছিলেন। দূর থেকে দেখছি সেই ঋষিমূর্তি হঠাৎ তাঁর ধ্যানভংগ হল, আদর করে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। তারপর সৎসংগের ফল যা হয় তাই, মুখে হাসি আর বুকে আনন্দ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম জলাপাহাড় রোডে।

যাচ্ছি—যাচ্ছি—যেতে যেতে এক সময়ে এসে পৌঁছলুম জলাপাহাড়ের মাথায়। চাঁচাছোলা ঝকৃঝকে তকৃতকে জায়গা এখানটি—প্রায়ই ইউরোপীয়দের বাস। একটু দূরে গোরা পল্টনদের খুব বড় ব্যারাক আর তার পাশেই বারুদখানা। আরও একটু দূরে স্নুন্দর সাজানো হাসপাতালের পাশেই খেলার মাঠ। এখান থেকে চারদিকের দৃশ্য অনেকটা মহা-কাল চূড়ার মতই—সেই চারদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে নীল সবুজের ছড়াছড়ি।

চারদিকের পাহাড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু একটা পাহাড় পড়ল আমাদের নজরে, নাম এর টাইগার হিল। এই তো একটু আগেই, যাই না কেন বেড়াতে বেড়াতে। পা বাড়িয়েছি টাইগার হিলের পথে। বেলা তখন পড়ন্ত। সেখানকার বাসিন্দা এক বাঙালী বুড়ো বললেন—করেন কি মশাই? এখন কি ওখানে যাওয়া যায়? ও যে সাত মাইল দূরে।

সত্যি তুমিও ঠিক মনে করতে এই পাশেই বুঝি বা টাইগার হিল। পাহাড়ে দেশের লোক না হলে পাহাড়ের দূরত্ব বোঝা শক্ত। আর একটা মজার কথা—নিচে থেকে দূরের উঁচু পাহাড়গুলোকে দেখায় নিচু আবার যত উঁচুতে ওঠা যায় আগের দেখা নিচু পাহাড়গুলোও উঁচু হতে হতে একেবারে ফেলে আকাশ ছুঁয়ে।

কি আর করি, আজকের মত টাইগার হিল যাওয়ার আশা ছাড়তে হল। এখান থেকে সূর্যদেবের উদয় অস্তের দৃশ্যের নাকি তুলনা মেলে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বরফের পাহাড় এভারেস্ট দেখা যায় এখান থেকে—যার চূড়ায় উঠতে কত চেষ্টা করে আজও মানুষ সফল হয় নি। সূর্যোদয় দেখতে হলে রাত তিনটেয় দার্জিলিং থেকে আসতে হয় ঘোড়া কিম্বা ট্যাক্সি করে। একে তো বেরিয়েছি একা, তাতে আবার চুপি চুপি, কাজেই আজকের মত জলাপাহাড় থেকেই টাইগার হিল দেখার সাধ মেটান হল।

পবনদেব ঝাঁট দিয়ে মেঘজঞ্জাল জড়ো করেছেন নিচের গর্তে, পশ্চিম আকাশে সূয্যি তখন ডুবুডুবু। ভোরের মত সোনাগালানো রূপের লহর তুলে কাঞ্চনজংঘা হাজার হাজার মাইল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সংগী সাথীদের নিয়ে। থমকে থেকে খানিক দেখে পা চালিয়ে দিলুম মহাকাল চূড়ার পানে।

পথে লোকচলাচল কমে এসেছে, বেড়াতে যারা এসে-ছিল প্রায় সবাই গেছে ফিরে, কেবল দু একজন এখানে ওখানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। অবজারভেটারির পাশে একটু নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসে বসে একমনে দেখছি কাঞ্চনজংঘার মন-ভোলানো রূপ, এমন সময় কানে এল নিতান্ত কচি গলার মিষ্টি সুরের গান—

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস
কাহার দেশে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি।

এমন গান বুঝি আর কখনো শুনি নি। কে গায়? খুঁজতে খুঁজতে দেখি আমার বসবার জায়গার একটু নিচেই পাহাড়ের খাঁজে পা ঝুলিয়ে বছর ছয়ের এক নেপালী খোকা রঙিন পোশাক-পরা ছোট বোনটিকে কোলের কাছে বসিয়ে দুজনে বাংলা গান ধরেছে মনের আনন্দে। ভুল হয়তো অনেক আছে তাদের উচ্চারণে কিন্তু এমন গান তো কোথাও

শুনি নি। এমন সুন্দর জায়গায় এমন সুযোগ্য সুললিত পদ-টুকু আর ভোরবেলার পাখীর মত মিষ্টি সুরটুকু সত্যিই কি যে একটা ভাব এনে দিলে। মনে পড়ে গেল বাংলা মায়ের কথা, আর মনের মধ্যে ঝলমল করে উঠল তোমাদের কচি কচি মুখগুলো। নিচের দিকে চেয়ে দেখি ও কি? উথলে-ওঠা দুধের মত চাপ চাপ সাদা মেঘ হু হু করে উঠে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। দেখতে দেখতে চারদিকের গাছপালা পাহাড় পর্বত সবই ডুবে গেল দুধসাগরের বানে। কি আশ্চর্য সুন্দর সে দৃশ্য—কি করে বোঝাই বল তো? সে যেন দুধের সাগর—যতদূর দেখা যায় কেবল শাদা আর শাদা। শুধু তিমির পিঠের মত মাঝে মাঝে জেগে আছে পাহাড়ের দু একটা নীল চূড়া। এ মেঘের খেলা, সত্যি সুন্দর, অতি সুন্দর, যা বলা যায় তার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর।

সাঁঝ হয়ে এসেছে, মেঘসাগরে ডুব মেরে নেমে চললুম বাসার দিকে। বাতাসের কাঁধে চড়ে মেঘগুলোও ভেসে চলল স্বর্গপানে।

মেঘের মতো তুমিও যদি বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারতে তো ভারি মজা হত নয়? একবার চেষ্টা করে দেখ না বাতাসের কাঁধে চড়ে আকাশে উঠতে। পারলে না বুঝি?

মেঘেরা কিন্তু পারে। কেমন করে পারে তা জানতে হলে তাদের জন্ম-পত্রিকাটাও একটু জানা চাই।

মেঘ যে জলকণা দিয়ে তৈরি এ কথা তো তোমার নতুন নয়। কিন্তু বাতাসের মধ্যে এই জলকণা আসে কেমন করে বল দেখি? নদ নদী খাল বিল হ্রদ সাগর সমুদ্র থেকে সূর্যের তাপে প্রতিদিনই জল শুকিয়ে বাষ্প হয়। বাতাসের চেয়ে হাল্কা বলে ঐ বাষ্প উঠে যায় অনেক উঁচুতে। বাতাস তখন আচ্ছা করে ঠাণ্ডা লাগিয়ে তাকে দেয় নিজের রাজ্য থেকে বার করে। হাওয়া থেকে বেরিয়ে যখন আসে, বাষ্প তখন আর বাষ্প থাকে না—সে হয়ে যায় জলকণা, আর এই সময়েই তোমরা তাকে দেখতে পাও মেঘ আকারে।

বাতাসের মধ্যে থেকে জলকণা যখন বেরিয়ে আসে, তখন ওগুলি থাকে খুব ছোট্ট আকারে। কুয়াসা তো দেখেছ, ওর জলকণাগুলো কত ছোট দেখেছ তো? মেঘ যে জলবিন্দু দিয়ে তৈরি তা আবার অসম্ভব রকমে ছোট। কত ছোট শুনবে? এই রকমের এক কোটি জলবিন্দু এক হলে তবে এক ফোঁটা বৃষ্টি তৈরি হয়।

এত ছোট হলে কি হয়, এরাও কিন্তু বাতাসের চেয়ে ভারী। বাতাসের বেগ না থাকলে এরাও নিচে পড়তে থাকে। তাই স্থির বাতাসের মধ্যে মেঘ ধীরে ধীরে নামতে

সুরু করে। জলকণার এই নিচে নামবার গতি মিনিটে প্রায় এক ফুট।

কিন্তু বাতাস তো আর লক্ষ্মীছেলে নয়, ও কখনো চুপ-চাপ থাকে না। বাতাসের স্থির হয়ে থাকাটা যেন অসম্ভব ব্যাপার। একবার হাওয়ার সংগে পাল্লা দিয়ে দেখ না। অস্থিরতার প্রতিযোগিতায় তোমাদের যে কোন দুষ্টু ছেলেকে হার মানাতে পারে সে। আবার মেঘও বড় চালাক—বাতাস যখনি অস্থির হয় সেও তখনি নেয় নিজের সুবিধা করে। নিমেষের মধ্যে বাতাসের কাঁধে চড়ে মজা করে খুব খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ায় আকাশে। মেঘের মত চালাক হতে পারলে বেশ মজা হতো নয়? তুমিও আসতে উড়ে, আমিও আসতুম উড়ে—বাড়ী না গিয়েও পথে দেখা হত দুজনেরই।

সিঞ্চল-তাল

আজ আমাদের যাত্রা একটু মজার। শহরের বাইরে যাচ্ছি সিঞ্চল-তাল আর ঘুম গোম্পা দেখতে। সিঞ্চল-তাল কি জান তো? সিঞ্চল হল জায়গার নাম, আর তাল হচ্ছে তালাও—পুকুর—জলাশয়। সিঞ্চল তোমাদের টালা ট্যাংক আর কি। এখান থেকে সারা দার্জিলিং শহরে জল সরবরাহ করা হয়। সিঞ্চল যেতে গেলে মিউনিসিপ্যাল আফিস থেকে ছাড়পত্র নিতে হয়। বাজারের কাছে মিউনিসিপ্যাল আফিসে আমাদের দলের জন্যে ছাড়পত্র আনা গেল সকালবেলাতেই। সংগে সংগে মোটরবাসও রিজার্ভ হল। এগারোটার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লুম দলবল নিয়ে। স্টেশন পেরিয়ে হু হু করে বাস চলল কার্ট রোড ধরে। প্রায় হাজারখানেক ফুট ঘুরপাক খেতে খেতে বাস এসে পড়ল কুয়াসায় ঢাকা চিরঘুমন্ত ঘুম স্টেশনে। কুয়াসার ভেতরে ভেতরে আরও আধ মাইল রেললাইন ধরে গেলেই কার্টরোড আর ক্যালকাটা রোডের মোড়। সেখান থেকেই উৎরাইএ বেরিয়েছে একটা রাস্তা আর সিঞ্চল হয়ে সেটা পৌঁছেছে টাইগার হিল পর্যন্ত। বুকের ভেতর আমাদেরকে নিয়ে বাস চলেছে দার্জিলিং থেকে আরও উঁচুতে।—সে রাস্তা যে কি ভীষণ আর কি সুন্দর।

কোথাও খল খল অট্টহাসি হাসতে হাসতে ধেই ধেই করে নেচে চলেছে ঝরণা, কোথাও বা শীত-কাতুরে বুড়োদের মত সবুজ শেওলার বালাপোষ গায়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ আকাশে মাথা ছুঁইয়ে। না আছে পাতা, না আছে ফুলফল, তাদের সারা গায়ে খালি শেওলা আর শেওলা।

মাঝে মাঝে আবার সবুজ পাতায় ভরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের নিবিড় বন জমাট কালো আঁধার কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাখ-পাখালির ডাকটুকুও শুনলুম না কোথাও। যা ঠাণ্ডা, হয়তো তারা থাকতেই পারে না এখানে।

বাস চলেছে হু হু করে সাপের মত আঁকাবাঁকা গতিতে। চেয়ে দেখি পাশেই একেবারে হাজার হাজার ফুট নিচু। একটু কাত হলেই হয়েছে আর কি—একেবারে চুরমার।

তাল পর্যন্ত যেতে পায় না তাই বাস দাঁড়াল একটু নিচে। উৎরাই পথে একটুখানি চললুম হেঁটে। শেওলায় ঢাকা বড় বড় গাছে ঘেরা শিঙ্কল শিখরের মাঝখানে অর্ধ-চন্দ্রের মত তিনটি জলাশয়। সবগুলিরই চারদিক পাকা ইটের গাঁথুনির ওপর সিমেণ্ট করা, একসংগে প্রায় ২০০ গজ লম্বা আর চওড়া ৫০ গজ। আশে পাশে দূর দূরান্তের পাহাড়ের মাথার ওপরের বরফ গলে হয়েছে কত ঝরণার সৃষ্টি, আর তাদেরই কতকগুলো দৌড়ে এসে একত্র মিশে

পড়ছে এই তালে। কলকাতার গংগার মত এখানকার জল তো আর নোংরা নয়, পরিষ্কার করাটাও তাই সোজা। ঝরণারা একত্র হয়ে যেখানে তালে পড়ছে তার প্রথম মুখেই দেয়া আছে একটা লোহার জাল। ওরা তো আসে কত দূর থেকে, কত কত বন-বাদাড়ের গা ঘেঁসে, তাই সংগে আনে কত ডালপালা কত পাতা জঞ্জাল এই সব। সেইগুলো যায় এই জালের ভেতর আটকে। তারপর ঐ ছাঁকা জল ঢোকে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে, যেখানে তার মিলন হয় কতকগুলো বিশোধক জিনিসের সংগে। তারপরে আর কি—সৎসংগের ফল তো আছেই। ভাল ছেলের সংগে মিশলে যেমন খারাপ ছেলেও ভাল হয়ে যায়, তেমনি ঐ বিশোধক জিনিসের সংগে মিশে খারাপ জলও হয়ে যায় নির্মল—বিশুদ্ধ। তারপরে ঐ বিশুদ্ধ জল বড় বড় নলের মধ্যে দিয়ে চলে যায় সমস্ত দার্জিলিং শহরে।

তালের চারদিকে শেওলায় ঢাকা বড় বড় গাছ, আর তাদের সংগে জড়িয়ে আছে ঘন মেঘ। হয়তো কোথাও একটুখানি পরিষ্কার আছে, অমনি কোত্থেকে পেঁজা তুলোর মত গাদা গাদা মেঘ এসে গাছপালা মানুষ সব লেপে মুছে একাকার করে দিচ্ছে।

চারদিক ঘুরে সিঞ্চল দেখা শেষ করতেই তো গেল ক্ষিধে

পেয়ে। সংগে টিফিন ক্যারিয়ারে টোস্ট আর ফ্লাস্কে ভরা গরম চা। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা গেল একটা পরিষ্কার শিলার ওপর বসে।

এবার ফিরতি-মুখে ঘুম গোম্পা। ঘুম স্টেশনের পশ্চিমে মোনাস্টারী রোড। এই রাস্তায় মিনিট দশেক চললেই গোম্পা।

বেশ নির্জন জায়গায়, একটি পাহাড়ের সমতল চূড়ায় কতকগুলি মন্দির নিয়ে তৈরি হয়েছে এই গোম্পা। মাঝ-খানের প্রধান মন্দিরটি সবচেয়ে বড়। মন্দিরের সমস্ত দেয়ালেই বড় বড় প্রাচীরচিত্র ভুটিয়াবস্তির গোম্পার মতই তিব্বতী ঢঙে আঁকা। ভেতরে মাঝখানে কর্মবুদ্ধের প্রকাণ্ড মাটির মূর্তি। মূর্তিটির গঠন অতি সুন্দর। মাটির মুকুট অংগদ কেয়ূর বলয়ে যে কারিগিরি দেখান হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বুদ্ধমূর্তির দুপাশে অমিতাভ বুদ্ধ ডালয়লামা লোকেশ্বর ও মহাগুরুর সুন্দর সুন্দর মূর্তি। আরও দুটি মূর্তির কথা না বলে থাকা যায় না। সে দুটি কি মূর্তি জান? তোমারই বাংলার গৌরব তিব্বতে বৌদ্ধধর্মপ্রচারক গুরু পদ্মসম্ভবের—আর একটি দীপংকরের। দেবতার সংগে এই ধর্মাচার্যেরাও সমানে পূজিত হচ্ছেন এখানে।

বুদ্ধমূর্তির সামনে খুব বড় দুটি পাত্রে সব সময়েই জ্বলছে

ঘিএর দীপ। আশে পাশে ছোট মন্দিরগুলিও বড় মন্দিরের মতই।

গোম্পায় আছেন অনেকগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু। পড়াশুনা ধর্মচর্চা করেই কাটে এঁদের জীবনের শান্তিময় অনাড়ম্বর দিনগুলি।

দেখে শুনে মন্দিরের সামনে বসেছি একটু পা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে, হঠাৎ দামামার গুরুগম্ভীর আওয়াজ পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনি তুললে। মঠ থেকে দলে দলে বেরিয়ে এলেন ছোট বড় মাঝারি সব আকারের সব বয়সের লামারা। বিচিত্র বেশ তাঁদের—সর্বাংগে চটকদার অদ্ভুত রঙের আলখাল্লা, অনেকের মুখে সিংহ হাতী বাঘ হরিণ কুকুর রাক্ষস আরও কত কল্পিত জীবের মুখের অনুকরণে ভয়ংকর মুখোস। অনেকের আবার রাজারাজড়ার মত সাজপোশাক। সকলের পায়ে ঘুঙুর।

গোম্পার সামনের উঠোনে লোকে লোকারণ্য। দামামার সংগে সংগে বেজে উঠল কত রকমের বাজনা—করতাল মন্দিরা ডম্ফ জগঝম্প আরও কত কি। তারপর আরম্ভ হল লামাদের বিচিত্র নাচ। নাচের বিষয়বস্তু হচ্ছে পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গের সুখ শান্তি আর পাপকর্মের ফলে নরকের দুঃখ অশান্তিটা দেখানো। বেশ শিল্পকলার কৌশল আছে এঁদের নাচে,

তবে পাপের ফল দেখাতে যা বীভৎস রসের পরিবেশন হচ্ছে ভাই, সত্যি, দেখলে ভয় করে, মানুষের মন আপনা আপনি

আরম্ভ হল বিচিত্র নাচ

পাপের পথ থেকে সরে যেতে চায়। এমনি করে নাচ গান আমোদ প্রমোদের ভেতর দিয়েও লামারা চেষ্টা করছেন মানুষের মনে ধর্মভাব জাগিয়ে তুলতে।

নাচ থামলে গোম্পা থেকে বেরিয়ে মোটর রাস্তায় চললুম ঘুমপাষাণ দেখতে। ঘুমপাষাণটি পাথরের এক বিরাট খণ্ড, প্রায় ১০০ ফুট উঁচু। রান্না-দির বাটনাবাটা নোড়ার মত এর গড়ন। নিচের দিকে এক সুড়ংগ আর মাথার দিকে চড়ুই-ভাতি করবার মত বেশ জায়গা। ঘুমপাষাণের গায়েই

একেবারে হাজার হাজার ফুট নিচু, আর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলার শ্যামল সমতল ভূমি ঠিক কার্সিয়াঙের মতই।

অনেক আগে লেপচাদের রাজত্বকালে গুরুতর অপরাধী-দের এখান থেকে ফেলে দিয়ে আছড়ে মেরে ফেলা হত। এখন কিন্তু ঘুমপাষাণকে এখানকার লোকেরা বিশেষ করে মেয়েরা ভারি সম্মান করে। এটা এখন তাদের সতীতীর্থ। কেমন করে হল শুনবে? সে আবার এক গল্প।

অনেক আগে এখানকার একটি ছোট ছেলের সাথে একটি ছোট মেয়ের ছিল খুব ভাব। বড় হয়ে তাদের দুজনের হল বিয়ে। তারপর এক কুঁড়ে বেঁধে দুটিতে থাকে খুব সুখে। সংসারের হাজারো রকমের দুঃখ কষ্ট—তারা গ্রাহ্যই করে না। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে প্রত্যেককে সুখী করতে। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না একতিলও। তাদের সেই শান্তিময় জীবনযাত্রাটুকু পাড়াপড়শীর সহ্য হল না। দুএকজনে গোপনে গোপনে চেষ্টা করতে লাগল তাদের সর্বনাশ করবার। সুযোগও মিলল। একদিন ছেলেটি গেছে কাজে—মেয়েটি বসে আছে তার ফেরার পথ চেয়ে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গিয়ে সন্ধ্যে হয়, আকাশে ঘন মেঘ—তবু ফেরে না তার স্বামী। ডুকরে কেঁদে ওঠে মেয়েটি,

একাই বেরিয়ে পড়ে অজানা পথে স্বামীর সন্ধানে। তারপরে আরম্ভ হয় মুষলধারে বৃষ্টি। ভিজতে ভিজতে যুবকও ফিরে আসে শূন্য কুটিরে। কুটির শূন্য দেখে তার মাথা যায় ঘুরে, এর বাড়ী তার বাড়ী খোঁজ নেয়। প্রতিবেশীরা বলে—সে চলে গেছে আর একজন যুবককে বিয়ে করে। বেচারা যুবক দুঃখে ঘুমপাষাণ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলে। এদিকে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে চারদিক খোঁজাখুঁজি করে সকালবেলায় মেয়েটি ফিরেছে কুটিরে, ফিরেই শুনলে তার স্বামীর আত্মহত্যার কথা। তারপরে আর কি—ছুটে গিয়ে সেও পড়ল ঘুমপাষাণ থেকে।

তারপর থেকেই এখানকার মেয়েদের কাছে ঘুমপাষাণটি হয়েছে সতীতীর্থ।

একটু বেড়িয়ে, একটু বসে ফিরলুম বাসায়।

বেলা তখন শেষ।

লেবঙের আশেপাশে

কাল রাত্রে কি দুর্যোগ। কদিন থেকেই মেঘেদের আনা-গোনা সুরু হয়েছে। কাল থেকে দাজিলিং ছেড়ে এক পাও নড়ে নি ওরা। সন্ধ্যের সময় ঘরের জানালাগুলো ছিল খোলা। বেড়িয়ে এসে দেখি বিছানা কাপড় সব ভিজে। কোন্ ফাঁকে যে চুপি চুপি ঘরে ঢুকে এই কাণ্ড বাধিয়েছে ওরা।

বিছানা বদলে দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়েছি কি না শুয়েছি আর সে কি গর্জন—যেন হাজার কামান গর্জে উঠে আকাশটাকে চৌচির করে দিচ্ছে। সংগে সংগে ঝমাঝম্ বর্ষণ। সে বর্ষণের আর বিরাম নেই। সারা দুনিয়াটা যেন ওলট পালট হতে চলেছে। শেষ রাতে বৃষ্টি গেল থেমে, কিন্তু শীত এল শতগুণে নেমে। কাজেই সকাল হল আমাদের আটটায়। আর উঠেই কি হল জান? কোথায় গেল মুখ ধোয়া, আর কোথায়ই বা গেল দাঁত মাজা। সবাই মিলে আগুনের ধারে বসে চা খাওয়া গেল দু কাপ করে। এতক্ষণে মনে হচ্ছে যেন হাত-পাগুলো ফিরে এসেছে আমাদের কাছে।

চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। একা না গিয়ে কি

করি বল ? এই শীতে ওরা কি আর চলতে পারবে ? মাঝ-পথেই হয়তো বলে বসবে—দাদামণি ফিরে চল, এগিয়ে চলার নেশা যখন পেয়ে বসেছে দাদামণিকে।

পথে এসে দেখি চারদিক শাদায় শাদা—বরফে ঢাকা। রাত্রে শুধু বৃষ্টিই হয় নি, শিলাবৃষ্টিও হয়েছে প্রচুর, আর তাই জমে চারদিকের পাহাড়ের মাথা বাড়ীর ছাদ পথঘাট সব ভরিয়ে ফেলেছে। মিউনিসিপ্যালিটির কুলিরা খন্তা নিয়ে লেগে গেছে রাস্তার পাশের বরফ পরিষ্কার করতে। এগিয়ে চলেছি চৌরাস্তায়। এর পূব গা ঘেঁসে নেমে গিয়েছে রংগিত রোড। তরতর করে নেমে চলেছি এই রাস্তা ধরে। বাঁ-দিকে স্টেপাসাইড ভবন পার হয়ে একটু এগিয়ে ইস্ট বার্চহিল রোডের মোড়। আরও খানিকটা যেতেই এসে পড়লুম নর্দার্ন্ বেংগল রাইফেলস্ এর কাছে। এটা কি বুঝলে না তো ? নর্দার্ন বেংগল রাইফেলস্ হচ্ছে ফৌজী পুলিশের আস্তানা। বাংলা দেশকে বাইরের শত্রু আর বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে এখানে থাকে গোরা পল্টন। এসব ভারত গবর্নমেণ্টের অধীনে।

বাংলা সরকারের অধীনে এখানেও আছে তিন কোম্পানী সেনানী আর এক কোম্পানী রিজার্ভ সৈন্য। এদের কাজ হচ্ছে লুটপাট চুরিডাকাতি এইসব ছোটখাট অরাজকতার

হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। সৈন্যদের বেশির ভাগই গুর্খা, নয় তো কাছারী।

আরও খানিকটা নিচে সেই ভুটিয়াবস্তি। এখানকার কথা তো আগেই শুনেছ। ছোট ছোট নোংরা কুঁড়ের মধ্যে বাস করে ডাণ্ডিওয়ালা মুটে মজুর খানসামা এই সব শ্রেণীর ভুটিয়া। কেরানী জোলা দোকানদার শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ভুটিয়াও থাকে এখানে। একটু এগিয়েই গোম্পা। গোম্পার সামনে দিয়ে পূবদিকে দুপাশে উঁচু উঁচু ঝাউগাছের মাঝ দিয়ে আঁকা বাঁকা সর্পিল গতিতে সটান চলে গেছে একটা রাস্তা লেবঙ পর্যন্ত। লেবঙ সমুদ্রপিঠ থেকে ৫৯৭০ ফুট উঁচু। তাহলে এখানটা দার্জিলিং থেকে কত নিচে তা বুঝতেই পারছ। লেবঙ কথাটা হয়েছে পাহাড়ী কথা আলিবুঙ শব্দ থেকে। আলিবুঙ মানে পাহাড়ের জিভ। শহর থেকে দূরে একটা বাদামী মত পাহাড়ের চূড়া সমতল হয়ে হয়েছে অনেকখানি জায়গা—দেখতে অনেকটা জিভের মতই বৈকি। কাজেই পাহাড়ীদের দেয়া নামটাও বড় গরমিল হয় নি।

লেবঙে আছে একটা ব্যাটালিয়ান বা হাজারখানেক পদাতি গোরা পল্টনের ব্যারাক। মাঝখানে ঘোড়দৌড়ের প্রকাণ্ড মাঠ। ঘোড়দৌড়ের সময় যা ভিড় হয় এখানে। ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে ফিরলুম আসা-পথেই।

ভুটিয়াবস্তির গোম্পার কাছাকাছি খাড়া একটা পাকডণ্ডি রাস্তা উঠেছে পাহাড়ের গায়ে। ঐ রাস্তা ধরে যাচ্ছি। বরাবর যেতে যেতে এসে পড়লুম বার্চহিল যাবার মাঝ রাস্তায়। বড় রাস্তা পার হয়ে আবার খানিকটা নেমে চলেছি ছোট রাস্তা ধরে। এলোপাথাড়ি বেড়ানো চলেছে আর কি।

কুলিদের দলে তাড়া পড়ে গেছে

খানিক পরে এসে পড়লুম বেশ বড় একটা চা-বাগানে। কদিন থেকেই তো বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। কুলিদের দলে তাড়া

পড়ে গেছে চা তোলবার। মাথায়-বাঁধা পিঠে-ঝোলান লম্বা ঝুড়ি ভর্তি করে চা তুলছে কত শত কুলিমেয়ে। তা না তুললেই বা চলে কেমন করে বল? চায়ের দৈনিক খরচ তো বড় কম নয়। এখন প্রায় সারা পৃথিবীর লোকেরই চা হয়েছে প্রধান পানীয়। আচ্ছা—চা কোথা থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল বল তো? চায়ের আদি বাসস্থান হচ্ছে চীন। চীন দেশের লোকেরাই প্রথমে চা ব্যবহার করতো ওষুধ হিসেবে। সে আজ প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা। এই চীনেরাই চাকে প্রধান পানীয় বলে মেনে নিলে কিছুদিন পরে। তারপর ধীরে ধীরে চীন থেকে চাএর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর সকল দেশে। ইউরোপে চা খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে মাত্র তিন শ বছর আগে। তখন ওখানে চাএর পাউণ্ড ছিল ষাট টাকা। কাজেই চা ব্যবহার করাটা ঘটে উঠত মাত্র ধনী লোকদেরই। ইংলণ্ডের লোকদের প্রথম চা ব্যবহার করার গল্প শুনলে হাসতে হাসতে তোমার পেট ফাটবে। ওরা কি করে চা ব্যবহার করত জান? চাএর পাতা সিদ্ধ করে জলটা দিত ফেলে, তারপর মাখন-মাখা রুটির ওপর সিদ্ধ চা-পাতাগুলি ছড়িয়ে পরম তৃপ্তি আর গর্বের সংগে চিবিয়ে চিবিয়ে খেত ইংলণ্ডের ধনীরা।

যাই হোক কারখানাটা তো ঘুরে ঘুরে সব দেখলুম।

কারখানার নেপালী কর্মচারী বুঝিয়ে দিলেন সমস্ত, চা তৈরির হাংগামাটাও বেশ বুঝতে পারলুম। ভাবছ বুঝি চাএর পাতা তুলে শুকিয়ে নিলেই খাবার উপযুক্ত হয়? মোটেই তা নয়। খাবারের উপযুক্ত করতে চাএর পেছনে কত হাংগামা শুনবে?

প্রথমে চা জন্মাতো খালি চীন দেশেই। এখন ভারতবর্ষ সিংহল আরও কত জায়গার বাছাই-করা জমিতে চাএর আবাদ হচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে জমিতে চাএর চাষ হচ্ছে দার্জিলিঙে। গাছেদের প্রায় বছর চারেকের মত বয়স হলে কুলিমেয়েরা বাগানে ঢুকে চাএর কচি কচি পাতাগুলি তুলে ফেলে ঝুড়ি ভর্তি করে। সারা বর্ষাটা যখন খুব বৃষ্টি পড়তে থাকে, তখন রোজই গাছেদের নতুন নতুন কচি পাতা গজায়। কুলিদেরও আর বিরাম থাকে না। পাতা-ভর্তি ঝুড়ি মেয়েরা আনে কারখানায়। সেখানে পাতাগুলি ওজন করা হয়। তারপর বড় বড় চেপ্টা ট্রেতে ওগুলি ছড়িয়ে দিয়ে কুড়ি ঘণ্টা ধরে রাখা হয় একটা তাপযুক্ত ঘরে। তাপে পাতা-গুলি হয়ে যায় বেশ নরম। তখন ওদিকে চালিয়ে দেয়া হয় একটা মেশিনের ভেতর দিয়ে। মেশিনের চাপে পাতাগুলি যায় কুঁকড়ে। এইবার এক ইঞ্চি থেকে দু ইঞ্চি পুরু করে পাতাগুলি ছড়িয়ে দেয়া হয় এক রকমের ড্রয়ারএর

মধ্যে। তারপর করে কি জান? অল্প ভিজে পর্দা চাপা দিয়ে ঐ ড্রয়ারগুলো রেখে দেয়া হয় একটা নিরিবিলি ঘরে। এই সময়েই পাতাগুলির রং বদলায় আর একটা মনোমুগ্ধকর গন্ধে চারদিক ভুরভুর করতে থাকে। এইবার পাতাগুলি বেছে ফেলা হয় ছোট বড় নানা আকারের চালুনি দিয়ে। গন্ধ আর আকার হিসাবে ভাল মন্দ ঠিক হয়ে যায় এই সময়েই। পাতাগুলিকে আর একবার শুকিয়ে নিয়ে সীসের পাতে মোড়া বড় বড় কাঠের বাক্সে বোঝাই করে গাড়ী বা নৌকায় চালান দেয়া হয় পৃথিবীর সব জায়গায়।

চা-বাগান থেকে ফিরলুম তখন বেলা বারোটা—আগে কি খেলুম বল তো?

বা রে—তা আবার হয় নি ? এতদিন রইলুম এখানে—কম বেশি সব জাতির লোকের সংগে আলাপ হয়েছে, সংগে সংগে তাদের রীতিনীতিগুলিও শিখে নিয়েছি একটু একটু করে। নেপালী ভুটিয়া আর লেপচা এই তিনটি প্রধান জাতির বাস এখানে তা তো আগেই শুনেছ। এই তিনটি জাতির প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকের চেহারা ধর্ম কর্ম আচার ব্যবহারের বেশ একটুখানি পার্থক্য আছে।

নেপালী স্ত্রী পুরুষ

দার্জিলিঙের প্রায় চার ভাগের তিনভাগ লোক নেপালী। এরা হিন্দু। তোমাদের মত এদেরও আবার জাতিভেদ আছে—উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ ছত্রি দামই গুরুং থাম্বু লিম্বু

কামী খস মগর নেওয়ার সেরপা স্থনোয়ার এইসব। জাতিভেদ যখন রয়েছে তখন বুঝতেই পারছ খাওয়া-দাওয়ার ভিরকুটিও আছে এদের মধ্যে। তোমাদের মতই উপাধ্যায় আর ব্রাহ্মণ হলেন বর্ণগুরু, তারপর ছত্রিরা। এরা খেতে পারে মাছ ছাগল ভেড়া বা হরিণের মাংস। ভাত ছাড়া আর সব জিনিসই কিন্তু এরা অন্য জাতির হাতে খায়। ব্রাহ্মণ ছত্রির পর গুরুং নেওয়ার মগর এইসব। এরা ব্রাহ্মণদের খাদ্য মাছ মাংস ছাড়া মুরগার মাংসও খায়। এদের চেয়ে নীচ জাতি হল যারা শূয়োরের মাংস খায়। আর সবচেয়ে নীচ গো-খাদকরা।

খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার থাকলেও ব্রাহ্মণ থেকে যে কোন জাতি অন্য জাতিকে বিয়ে করতে পারে। এদের ছেলেরা পায় বাপের জাতি, আর মেয়েরা পায় মায়ের জাতি। বিয়েও এদের বেশ মজার। তোমরা বাঙালী, তোমা-দের বিয়েতে কন্যাপক্ষ টাকা দেয় বরপক্ষকে, এদের কিন্তু বরপক্ষ টাকা দেয় কন্যাপক্ষকে। তবে তোমাদের মত পাঁচ দশ হাজার টাকার দরকার তো হয় না এদের, ত্রিশ টাকা থেকে সত্তর আশি টাকা হলেই বেশ ভাল একটি বউ পাওয়া যায়। বনিবনাও না হলে এরা আবার বিয়ে ফেরত নেয়। তখন মেয়ের নতুন বর পুরোনো বরকে পণের টাকা ফিরিয়ে দেয়। তবে তখন সত্তর টাকার জায়গায় দিতে হয়

আশি টাকা। এদের সমাজে বিধবা-বিবাহও আছে। সেরপা আর লিম্বুর মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ, আবার অনেকে সনাতনী হিন্দু। তা বলে ওদের মধ্যে খাওয়া ছোঁওয়া বা বিয়ে-থা বন্ধ নয়।

নেপালীরা অনেকে চাকুরে বাবু, অনেকে দারোয়ানি বা হিন্দুদের গৃহস্থালীর কাজ করে। মুটে মজুর চাষবাসের কাজও যে একেবারে করে না, তা নয়।

সাধারণত নেপালীরা বেশ কর্মঠ পরিশ্রমী ভদ্র আর

লেপচা স্ত্রী পুরুষ

বিশ্বাসী। তবে রাগলে কিন্তু এরা খুনোখুনিও করে বসে। আর একটা দোষ হচ্ছে—এরা বড্ড বেশি মদ খায়।

লেপচারা অনেক কাল থেকেই বৌদ্ধ। লামা এদের

পুরোহিত। এরা অনেকটা অসভ্য গোছের। কত লেপচা এখনও বুনো ফলমূল, না হয় পশুর মাংস খেয়ে থাকে। তারা এখনও সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসতে চায় না। চাষ কাঠুরের কাজ বা পশুচরানই এদের প্রধান জীবিকা। কেউ কেউ মুটে মজুরের কাজও করে। লোকালয়ের সংসর্গে যারা এসেছে তাদের মধ্যে অনেক লেপচা আবার খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছে।

ভুটিয়ারা বেশির ভাগ বৌদ্ধ। এদেরও পুরোহিত লামা। এরা অনেকটা শিক্ষিত আর সভ্য হয়ে উঠেছে। জমিদার রাজ-কর্মচারী ব্যবসায়ী—এদের মধ্যে অনেকেই। চাষ-আবাদটা

ভুটিয়াদের স্ত্রী পুরুষ

এদের মধ্যে একরকম নেই বললেই চলে। ভুটিয়াদের হুকপা নামে একটা ছোট জাতি আছে, তারাই চাষ-আবাদ করে,

কেউ বা ডাণ্ডি টানে। বিয়ের ব্যাপারটা এদের আরও মজার। মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠিরদের মত এরা কয় সহোদরে মিলে একটি বউ বিয়ে করে। কেউ মারা গেলে ভুটিয়ারা কি করে জান? গরীব যারা তারা গোর দেয় আর ধনীরা তোমাদের মত পুড়িয়ে ফেলে।

এই হল এখানকার প্রধান অধিবাসী তিনটি জাতির আচার ব্যবহার ঘর-গেরস্থালীর মোটামুটি কথা।

টাইগার হিলে

কদিন থেকে আকাশটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে মেঘেরা চলেছে বাড়ী। ঝক্‌ঝকে সোনালী রোদ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে শীতের জড়তাটা কাটিয়ে দিচ্ছে। এমন দিনে কি চুপটি করে মুখটি বুজে ঘরে বসে থাকা যায়? তুমিই বল না। আজ এসেছি কোথায় জান? জলা পাহাড় থেকে কাছের দেখা দূরের পাহাড়টা না? আজকে আমি সেইখানে —মানে টাইগার হিলে আর কি। এখান থেকে সূর্যোদয়টা না দেখলে কি চলে? কাল বিকেলে পাঁচটার ট্রেনে চড়েছি দার্জিলিং স্টেশনে, সংগে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার।

পাহাড়ের কোলে দিনের আলো ঢলে ঢলে, সাঁঝের আলো জ্বলে জ্বলে, নেমে পড়লুম চিরঘুমন্ত ঘুমে। পাহাড়ী মুটের মাথায় বোঝা চাপিয়ে চলেছি ঘুমজীন ধরে টাইগার হিলের রাস্তায়। দুপাশে কুহেলী-ঢাকা কুহক-মাখা দৃশ্য— যেন মায়াকাঠির ছোঁয়াচ-লাগা ঘুমন্ত পুরী। সারাসারি শেওলা-পড়া আঁধার-ঘেরা গাছেরা নীরব নিস্তব্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে। চড়াইএর পথে চলেছি সোজা। মাইল দুই চড়াই উঠবার পর পৌঁছলুম সিঞ্চল ডাক-বাংলোয়। রাতটা সেখানেই কাটল, অবশ্য এমনি নয়—দু টাকা করে দক্ষিণার বদলে।

হাত মুখ ধুয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের খাবারগুলোর সদ্গতি করে তো শুয়ে পড়া গেল রাত্রিটার মত। শুলেই কি আর ঘুম হয়? কতক্ষণে উঠব টাইগার হিলের বুকে, কতক্ষণে দেখব অপরূপ সূর্যোদয়, দেখব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বত-শৃংগ এভারেস্ট—উশখুস্ করতে করতেই বাজল চারটে। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় জামা পরে চড়তে আরম্ভ করেছি টাইগার হিলে। ভোরের শিরশিরে হাওয়ায় হাত পা জমে আসছে তবু চলেছি খোলা পাষাণের গায়ে রাস্তা ধরে। খানিক পরেই টাইগার হিলের মাথায় এসে পৌঁছান গেল। সিঞ্চল বাংলো ৮১৬৩ ফুট উঁচ, আর এখানটি হচ্ছে ৮৫১৪ ফুট। এ লাইনের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, তাই এখান থেকে চারদিকের দৃশ্যও অতুলনীয়।

ভোরের প্রতীক্ষায় বসে আছি, হঠাৎ পূবদিকে চেয়ে দেখি পাহাড়ের পা তলায় লালে লাল, সে যে কি লাল—আগুন-রঙা লাল, জবা ফুলের লাল, পলাশ ফুলের লাল, খুন-খারাবি লাল, ডালিমফুলি লাল—সব লালেরই একত্র সমাবেশ। এ যেন রং-সায়রে বান ডেকেছে। সেই চোখ-ঝলসানো রক্ত-সমুদ্রে স্নান করে সহস্র কিরণ ছড়িয়ে অরুণ রথে উঠছেন জবাকুসুমসংকাশ সূর্যদেব। ওপরে অনন্ত শূন্যের গায়ে রঙের খেলা, নিচেও অনন্ত শূন্য—যেন পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে

ওখানেই, আর সেই শেষের দেশে আরম্ভ হয়েছে সূর্যলোক। কি বিরাট কি মহান দৃশ্য। মন ডুবে যায় বিস্ময়-সাগরে।

পিছন ফিরে উত্তরদিকে দেখি—সোনায় সোনায় মোড়া পূব পশ্চিমে লম্বা মাইলের পর মাইল জুড়ে কাঞ্চনজংঘা তুষার-শ্রেণী, আর পশ্চিমে নেপালের মাথার ওপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হিমশিখর এভারেস্ট সংগীসাথীদের নিয়ে মহা গৌরবে দাঁড়িয়ে। এ যে কি মহান দৃশ্য, আর এ দৃশ্য দেখতে দেখতে মন যে কোন অসীমে চলে যায় তা বোঝাবার ভাষা সত্যি নেই। অপরূপ—অতি অপরূপ রূপ সৃষ্টি, এ রূপের—এ শোভার তুলনা নেই। কত আদিমকাল থেকে কত কবি, কত বৈজ্ঞানিক হিমালয়ের সৌন্দর্য আর সম্পদের কথা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তবু কি এর রূপের পূরোপূরি বর্ণনা কেউ দিতে পেরেছেন ?

এভারেস্টের কথা শুনতে শুনতে হিমালয়ের সমস্ত চেহারার কথা একবার জেনে নাও। ভারতের সারা উত্তর-দিকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় প্রায় ১৫০০ মাইল লম্বা, আর জায়গায় জায়গায় ১৫০ মাইল চওড়া। হিমালয়ের অনেকগুলি শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। উত্তরে কারাকোরাম আর হিন্দুকুশ। ওদের সংগে যোগ আছে পশ্চিমের সুলেমান আর কিরথর পর্বতশ্রেণীর। পূবদিকের

পাটকোইশ্রেণীও হিমালয়েরই শাখা। ভারতের উত্তর ভাগের সমতল থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে হিমালয় তিনটি থাকে ভাগ হয়েছে। প্রথম থাক ৩০০০ ফুট উঁচু, দ্বিতীয় থাক ৭০০০ ফুট, আর তৃতীয় থাকের উচ্চতা ২০,০০০ ফুট থেকে এভারেস্টের মাথা ২৯,১৪১ ফুট পর্যন্ত। ১৬,০০০ ফুট থেকে ১৯,০০০ ফুটের পরেই বরফে বরফে হিমালয় একেবারে পক্ককেশ বৃদ্ধটি সেজে বসে আছে। হিমালয়ের বরফ-ঢাকা চূড়াগুলির মধ্যে এভারেস্টই হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু। এর উচ্চতা ২৯১৪১ ফুট, কেউ বা বলেন ২৯,০০২ ফুট। এর বাংলা নাম গৌরীশংকর। নেপালের পূবে কাঞ্চনজংঘা ২৮,১৪১ ফুট উঁচু। এর ভাই বোনদের কথা তো শুনেইছ। নেপালের পশ্চিমে ধবলগিরি। এ ছাড়া নন্দাদেবী নাংগা পর্বত কৈলাস হিমালয়ের নামকরা তুষারশৃংগ। মাউণ্ট গডউইন অস্টিন শিখরটি কারারোরাম পর্বতে। ইনিও বড় কম যান না, এঁর উচ্চতা ২৮,২৬০ ফুট—মানে কাঞ্চনজংঘার চেয়েও উঁচু। গডউইন অস্টিন সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন বলে তাঁর নামেই এর নাম হয়েছে। যাই হোক সকলের কথা বাদ দিয়ে চোখের সামনে এখন যা দেখছি সেই এভারেস্টের কথা শোন। এভারেস্ট কেমন করে নাম হল জান তো? ভাবছ বুঝি গডউইন সাহেবের মত এভারেস্ট

সাহেব এটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে ? তা নয়, এভারেস্ট আবিষ্কার করেছিলেন তোমাদেরই একজন বাঙালী, নাম তাঁর শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার। শিকদার মশাইএর জন্ম হয় ১৮১৩ খ্রস্টাব্দে কলকাতা মহানগরীর বুকে। বড় হয়ে তিনি কাজ করতেন সার্ভে অফিসে—মানে জরিপ বিভাগে আর কি। হিমালয়ের গভীর অরণ্য আর পাহাড়ে অংশটাই পড়ল তাঁর ভাগ্যে জরিপের জন্যে। কাজেই তাঁকে সর্বদাই যেতে হত এই সব দুর্গম জায়গায়। এই সময়েই তিনি সন্ধান পান গৌরীশংকর শৃংগের। সেটা হচ্ছে ১৮৫২ খ্রস্টাব্দের কথা। পরে হঠাৎ একদিন আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে শিকদার মশাই ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লেন তাঁর ওপরওয়ালা কর্মচারী সার এণ্ড্রুজ ওয়ামের ঘরে। এণ্ড্রুজ সাহেব তো অবাক—ব্যাপারটা কি ? রাধানাথবাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—মশাই, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু তুষার-শৃংগ আবিষ্কার করেছি আমি। সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন তাই নাকি ? প্রমাণ করে দেখান তা হলে। রাধানাথবাবুও পেছবার লোক নন, তিনি আগে থাকতেই ভেতরে ভেতরে গবেষণা করেছেন এ বিষয়ে। সাহেবকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর গবেষণার ফলাফল। সাহেব তো খুব খুশি। তিনি স্বীকার করলেন—রাধনাথবাবুই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু

পর্বতশৃংগ আবিষ্কার করেছেন। সে সময়ে সার্ভে বিভাগের বড় কর্তা ছিলেন সার জর্জ এভারেস্ট। তাঁরই নামে এই শৃংগের নাম হল এভারেস্ট।

বাঙালীর আবিষ্কৃত হিমশিখরের অফুরন্ত সৌন্দর্য দূর থেকে দেখছি আমরা বাঙালী, কিন্তু বিশ্ববিজয়ী মানুষের দল কি করেছে জান? তারা বার বার ছ বার চেষ্টা করেছে এই দুর্জয় গিরিশৃংগকে জয় করতে। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে, শত বাধা বিপদ অগ্রাহ্য করে, তাঁরা এগিয়ে চলেছেন এভা-রেস্টের রহস্যে-ঢাকা অজানা রূপকে রহস্যের আবরণ সরিয়ে জানার মধ্যে আনতে। সফল হন নি কোন বারেই, প্রাণও দিতে হয়েছে অনেককে, কিন্তু তা বলে কি পিছ-পা হয়েছেন এঁরা? বার বার যত বাধা-বিঘ্ন আসছে ততই এঁদের উৎসাহও যাচ্ছে বেড়ে। মুসড়ে পড়া বা ঘাব্‌ড়ে যাওয়া বলে কোন কথা যেন নেই এঁদের অভিধানে।

সারাটা দিন আজ কাটল টাইগার হিলে। দিনটা আজ প্রায় পরিষ্কার রয়েছে, তবে মাঝে মাঝে কুয়াসার ঘোমটা টেনে এভারেস্ট দিচ্ছে নিজের মুখ ঢেকে।

এভারেস্ট আর তার আবিষ্কর্তাকে মনে মনে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলুম বেলা তিনটেয়।

অভিযানের উদ্‌যোগপর্ব

ডিসেম্বর মাসের মাস্টার মশাইদের মত একগাদা প্রশ্ন করে বসলে যে? পদে পদে মৃত্যুর ভয় বলে মানুষ এগিয়ে চলবে না? বা-রে, প্রকৃতি চায় মানুষের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে—মানুষকে নিজের অধীনস্থ করে রাখতে। মানুষ কিন্তু চায় না তার প্রভুত্ব স্বীকার করতে—সে চায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করতে। নিজের বুদ্ধির বলে মানুষ চায় প্রকৃতিকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে, আপনার প্রয়োজন মত তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে। সে চায় প্রকৃতির মধ্যে অজানা যা, অজ্ঞাত যা, যা তার জ্ঞানের বাইরে তাকে জানতে, তাকে আনতে তার জানার মধ্যে—তার জ্ঞানের গোচরীভূত করতে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের এই যে অভিযান, এই স্বভাবটাই মানুষকে শিখিয়েছে আকাশে উড়তে, জলে ভাসতে, এক মাসের পথ একদিনে দৌড়তে, আর তারই প্রাণঘাতী আকাশের বিদ্যুৎকে কেনা চাকরের মত হুকুমের গোলাম করে রাখতে। এই স্বভাবটাই মানুষকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে দিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির প্রেরণা আনে তার মনে, আর আনে প্রচুর আনন্দ আর সাফল্যের গৌরব।

পাহাড়ে যারা চড়ে তাদের মধ্যেও ঐ একই কথা—দুর্গমকে সুগম করতে হবে, অজানাকে জানতে হবে, অদেখাকে দেখতে হবে। অবশ্য পাহাড়ে ওঠা খুবই শক্ত, তা হলেও শক্ত কাজ করবার মত শক্তিও তো আছে মানুষের। মানুষের মনের জোরের কাছে কোন বাধা বিঘ্ন বিপদ আপদ টেকে কি ?

তবে যে সে কি আর পাহাড়ে উঠতে পারে ? তার জন্যে লোক বাছাই করে নিতে হয় বৈ কি। প্রথমতঃ পর্বতারোহী হবে খুব সাহসী। কি রকম সাহসী জান ? চারতলার ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যদি নিচের দিকে দেখ, তোমার বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে তো, মাথাটা যেন ঘুরে যায় বলে মনে হয়, না ? এটি কিন্তু চলবে না। পর্বতারোহীর চোখ হবে এমন যে পায়ের তলায় হাজার হাজার ফিট নিচু দেখেও তার ভয় না হয়, বা পা না কাঁপে। আবার হয়তো কোথাও মাথার ওপর ঝুলে আছে প্রকাণ্ড পাথর—মনে হচ্ছে এই পড়ল বুঝি ঘাড়ের ওপর ঝুপ করে। তার তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে যাবার সময় নিজের ওপর চাই নির্ভরতা। আবার চাই সংগীসাথীদের ওপর বিশ্বাস, যাদের সংগে চলতে হবে একত্র কোমরে দড়ি বেঁধে। একজনের যদি পা ফস্‌কায় তো কি হবে তা বুঝতেই পারছ, তা হলে সবারই মৃত্যু

অনিবার্য। এ ছাড়া সতর্কতা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দরকার। পাহাড়ের প্রকৃতিটা যে বড় খামখেয়ালী। চলেছ—হঠাৎ গভীর কুয়াসায় চারদিক ফেল্লে ঢেকে, কাছের জিনিসও আর দেখা যায় না। হয়তো পায়ের কাছেই আছে অতলকুণ্ড, না হয় চলমান বরফের স্তুপ, তার ওপর পড়লেই তো সব শেষ। কোথাও বা চারদিকে বরফের চাঁই ভাঙার এমন শব্দ যে কানে তালা লাগবার যোগাড় হয়, বুকের মধ্যে পড়তে থাকে হাতুড়ির ঘা। এ সমস্তকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি থাকা চাই পর্বতারোহীর—মানে মানসিক দুর্বলতার লেশমাত্র থাকলে চলবে না আর কি। সবচেয়ে বড় কথা—শরীরের কথা। পর্বতারোহী অধিকারী হবে স্বাস্থ্যসুন্দর দেহের, তার রক্তের প্রতিটি কণায় থাকবে রোগ তাড়াবার অসীম শক্তি। খেয়ালী প্রকৃতির নিজস্ব খেলাঘর যেন পর্বতরাজ্য। তাই এখানকার রোগগুলোও আক্রমণ করে যেমন ভীষণভাবে, খেয়ালী লোকের মত সেরেও যায় তেমনি চট করে, নয়তো রোগী যায় একেবারে ভবলীলা সাংগ করে। সেরে যারা যায় তারা কিন্তু অক্ষম হয়ে পড়ে জন্মের মত। তারপরে শীত। সাধারণ জীবনযাত্রার জন্যে খাওয়া-দাওয়া দেখা-শুনা নক্সা আঁকা সবই সেখানে কঠিন। সেখানকার ঠাণ্ডার জন্যে

অসুবিধে প্রত্যেকটি কাজেই। ঠাণ্ডা এত অসহ্য রকমের যেন গায়ের চামড়ায় ছুরি চালায়। কাজেই এই সব কষ্ট আর রোগকে বাধা দেবার শক্তি থাকা চাই পর্বতারোহীর। এক কথায় পর্বতারোহী হবে স্বাস্থ্যবান—দেহে আর মনে। কাজেই আরোহীদল বাছাই করাও যে বেশ শক্ত তা তো বুঝতেই পারছ।

তুমিই বল না, এত কষ্ট স্বীকার করে মানুষ পাহাড়ে ওঠে কেন? শুধুই কি কষ্ট? এর একটা আনন্দের দিকও আছে বৈকি—সে আনন্দটা হচ্ছে প্রকৃতি জয়ের। কল্পনারও অতীত কত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সন্ধান পায় পাহাড়ে-চড়ার দল। দূর থেকে দূরান্তরে তারা চলে নিত্যি নতুন দেশে, নতুন জাতির নতুন মানুষের সংস্পর্শে এসে সব কষ্ট, সব দুঃখ দূর হয়ে যায় নিমেষে। নতুন নতুন আনন্দে তাদের বুক হয় ভরপুর। তার ওপরে পর্বতজয়ের গৌরব তো আছেই।

এই নেশাতেই মানুষ ছ ছবার চলেছে হিমালয় জয় করতে। প্রতিবারেই তারা হয়েছে বিফল, কিন্তু উৎসাহ তাদের কমে নি। হিমালয় তো আর যে সে পর্বত নয়, এ হল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু—নগাধিরাজ। ইউরোপের সবচেয়ে বড় পর্বত আল্পস। এর সবচেয়ে উঁচু শিখর মণ্ট ব্লাংক ১৫,৭৭৫ ফুট, তোমাদের হিমালয়ের অর্ধেকটা আর কি।

আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত কিলিমানজ্জারো ১৯৬৮০ ফুট।

উত্তর আমেরিকায় সবচেয়ে বড় শিখর ম্যাক্ কিন্‌লি ২০,৩০০ ফুট উঁচু, আর দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড়শিখর একোন্‌কাগুয়া। এও ত ২৩,৯১০ ফুটের বেশি নয়। তোমাদের হিমালয়ের তো ১১০০ শিখরই আছে, যাদের উচ্চতা ২০,০০০ ফুটেরও বেশি। ৬টা শিখরের উচ্চতা ২৫,০০০ ফুটের বেশি আর তিনটে চূড়ার উচ্চতা ২৮,০০০ ফুটেরও বেশি। এতগুলি চূড়ার মধ্যে এ পর্যন্ত ঠিক ঠিক ওঠা গেছে মাত্র ছুটোয়—কাবরু আর কামেতে। এ হেন হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া এভারেস্ট, তাতে চড়া কতখানি শক্ত ব্যাপার বল দেখি। কিন্তু তবু মানুষ এগিয়েছে এই দুঃসাহসের কাজে।

হ্যাঁ—হিমালয় অভিযানের আগে আরও অনেকে উঁচু পাহাড়ে উঠবার চেষ্টা করেছেন বৈকি। ডাঃ লংস্টাফ ছিলেন খুব নামকরা পর্বতারোহী। ইনি একবার উঠে-ছিলেন ২৩,৪০০ ফুট এক শিখরে, তারপরে অন্য এক শিখরে ওঠেন ২৪,০০০ ফুট পর্যন্ত। এ সময়ে কি হয়েছিল জান? মরণের সংগে মুখোমুখি করে ফিরে এসেছেন এক অদ্ভুত উপায়ে। বরফ ধ্বসে পড়ার সংগে সংগে সংগী সাথী

সবশুদ্ধ কোথায় তলিয়ে গিয়েও বেঁচে গেলেন ভাগ্যের জোরে। ডাঃ ওয়ার্কম্যান উঠেছিলেন ২৩,৪০০ ফুট। পরে তাঁর স্ত্রীও উঠেছিলেন এতদূর পর্যন্ত। এর আগে আর কোনও স্ত্রীলোক এত উঁচু পাহাড়ে উঠেন নি। ইণ্ডিয়ান সার্ভে অফিসের মীড সাহেব তাঁবু খাটিয়েছিলেন ২৩,৫০০ ফুট উঁচুতে। সবশেষে ইটালির রাজপুত্র ডিউক অফ আব্রাজী উঠেছিলেন ২৪,৬০০ ফুট।

এভারেস্ট অভিযানের আগে এর চেয়ে বেশি উঁচুতে আর কেউ উঠতে পারেন নি।

পরের চিঠিতে জানাব এভারেস্ট অভিযানের কথা।

এভারেস্ট অভিযান

এভারেস্ট অভিযানের কথা শোনবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ বুঝি? যাক আর ব্যস্ততায় দরকার নেই এখন চুপটি করে শোন।

এভারেস্ট অভিযানের মতলবটা প্রথমে এসেছিল সার ফ্রান্সিস ইয়ংসব্যাণ্ড ও জেনারেল সি, জি ব্রুশের মাথায়। সে তখন ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মহাযুদ্ধের আগে। তখন কিন্তু গভর্নমেণ্ট হুকুম দেন নি। তার অনেকদিন পরে যুদ্ধ গেছে থেমে, শান্তির আবহাওয়া চারদিকে। আলপাইন ক্লাব আর রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অনেক টাকা যোগাড় করলেন, আর কলোন্যাল হাওয়ার্ড বারী এলেন ভারতে হিমালয় অভিযানের হুকুম নিতে। কিন্তু শুধু গভর্নমেণ্টের হুকুম হলেই তো চলবে না, তিব্বতের ডালয়লামারও অনু-মতি চাই। এভারেস্টে যেতে হলে তিব্বত থেকেই উঠতে হবে যে। যাই হোক লামা এঁদের হুকুম দিলেন।

ইতিমধ্যে বেশ বড়সড় একটা কমিটি গড়া হল। হিমালয় তো আর যে সে পাহাড় নয়, যে আগেকার মত অল্প কজন বাছা বাছা লোক নিলেই চলবে। এখন কমিটির প্রধান কাজ হল কি কি জিনিস নিতে হবে তাই ঠিক করা।

সবপ্রথম হল হাওয়ার ব্যবস্থা। পাহাড়ে যত উঁচুতে ওঠা যায়, হাওয়ায় অক্সিজেনের ভাগও যায় ততই কমে। ফলে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় ভীষণ, আর পাও পারে না চলতে। পরীক্ষা করে দেখা গেল অক্সিজেনের দরকার হবে জনপ্রতি ৫ পাউণ্ড করে। বোঝাটা বড় কম নয়। তারপর খাওয়া থাকার ভাবনা। একে তো দারুণ শীত, তার ওপরে চারদিকে ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদ আপদ। গায়ের জোর কমালে চলবে না---কাজেই তাঁবু আর খাবার চাই প্রচুর। এগুলো বয়ে নিয়ে যেতে কুলিও চাই অনেক। অভিযানে যোগ দেবার জন্যে আবার দরখাস্ত নেয়া হয়েছে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই। অবশ্য ইংরেজ ছাড়া আর কারুরই যাবার হুকুম রইল না এতে। কাজেই দলটি যে মস্ত বড় হল তা বেশ বুঝতে পারছ।
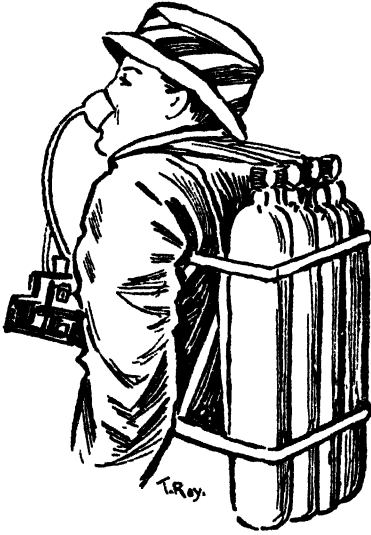
বোঝাটা বড় কম নয়

ইয়ংসব্যাণ্ড আর ব্রুশ নিলেন এই অভিযানের দায়িত্বভার। এঁদের সাহায্যকারী হলেন—লংস্টাফ, ডাঃ কেলাস, হাওয়ার্ড বারী, হেরল্ড রেবার্ন, ইণ্ডিয়ান সার্ভে আফিসের কজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, আর আল্পাইন ক্লাবের সভ্যেরা। ডাঃ রেবার্ন, কেলাস, ডাঃ জি, এস, ম্যালোরী আর বুলককে নিয়ে তৈরি হল আরোহীদল। মেজর মরশেডের সাহায্য নিয়ে মেজর হুইলার তৈরি করলেন ম্যাপ। ডাঃ এ, এফ, আর ওয়ালাসটন নিলেন চিকিৎসার ভার। আর ডাঃ হিরণ হলেন ভূতত্ত্ববিদ্।

জিনিসপত্র কেনাকাটা, বাঁধাছাঁদা, লোকজন যোগাড় করতেই কেটে গেল অনেকদিন। এসবগুলো অবশ্য করতে হল জেনারেল ব্রুশ আর কলোন্যাল হাওয়ার্ড বারীকেই।

এরপর সময়ের কথা—কোন সময়টা পাহাড়ে ওঠার উপযুক্ত হবে, ওপরে বর্ষাবাদল সহ্য করতে হবে না, সমস্ত বুঝে-সুঝে বেরোবার সময় ঠিক করা হল।

দার্জিলিং থেকে যাত্রা সুরু হল ১৯২১ খৃস্টাব্দের ১৮ই মে। লটবহর নিয়ে সংগে চলল বাছা বাছা বাইশজন কুলি আর পঞ্চাশটি অশ্বতর। এ ছাড়া দেখাশোনা করবার লোক তো আছেই। পরের দিন আরও পঞ্চাশটি অশ্বতর তাদের অনুসরণ করলে।

তিস্তা ভ্যালিতে পৌঁছতেই আরম্ভ হল ভীষণ বর্ষা। সে বর্ষার আর বিরাম নেই—অভিযানেরও বিরাম নেই। বৃষ্টি থামল তিব্বতের জেলাপ পাস পার হয়ে। চুম্বি উপত্যকায় যাত্রীরা পেলেন বেশ ঠাণ্ডা আর শুকনো আবহাওয়া। প্রাকৃতিক শোভা তাদের পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিলে। পথের ধারে থরে থরে ফুটে আছে আগুনের মত টকটকে লাল রডোডেনড্রন ফুল। সবুজ পাহাড়ের কোলে কোলে শাদা বেগুনী হলদে রঙের প্রিমরোজ। চারদিকে গভীর জংগল। রং বেরঙের পোশাক-পরা এখানকার অধিবাসীরা যেন থিয়েটারে সাজা মানুষ। এরা দেখতে যেমন অদ্ভুত নোংরাও তেমনি বিশ্রী রকমের।

তা হলেও এদের ব্যবহার কিন্তু অন্তরংগ বন্ধুর মত অমায়িক সরল। ডালয় লামার আদেশে অনেক মঠে হয়েছিল অভিযানকারীদের অভ্যর্থনার আয়োজন। এ ছাড়া উপায় কি বল? এঁকে বেঁকে প্রায় ২০০ মাইল লম্বা পথে যেতে হবে এভারেস্টের দিকে। জংলা পথে মাঝে মাঝে খরস্রোতা পাহাড়ে নদী বয়ে চলেছে বরফের মত ঠাণ্ডা জলের স্রোত নিয়ে। এদের পাড় আবার এমন গড়ানে ঢালু যে সেদিকে যাওয়া খুব বিপদ। কাজেই বসতির দিকে যাওয়াটাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। আর এমনি যেতে

যেতে মঠে মঠে লামাদের আশ্রয় নেয়া ছাড়া উপায় কি? লামারা তাঁদের দিতেন বিশ্রী চা, জল শুকনো চর্বি পচা মাখন নুন এইসব। মুখ বুজে তাঁদেরও তাই খেতে হত। খেলেও বমি আসে, না খেলেও যে লামাদের মনে কষ্ট হয়।

চুম্বি পেরিয়ে যেতেই অনেকের আমাশয় আরও অনেক অসুখ হতে আরম্ভ করলে। ডাঃ রেবার্ন পীড়িত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ হার্টফেল করে ডাঃ কেলাস মারা গেলেন খাম্বাজং প্রাসাদে। তাঁর প্রিয় পাহাড়ের পথেই হল তাঁর সমাধি।

অভিযান চলেছে এগিয়ে। যেতে যেতে পড়ল জুন মাস। জুনমাসের সংগে সংগে নামল বর্ষা। পার্বত্য নদীর কানায় কানায় ভরে বান ডাকল, পাহাড়ে পাহাড়ে আরম্ভ হল ঝড়ের মাতামাতি। মাঝে মাঝে অভিযানকে নিতে হল বিশ্রাম।

বর্ষা শেষ হতেই গরম পড়ল। দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হল অভিযানের কাজ। হুইলার খুব সুন্দর ম্যাপ তৈরি করলেন। হিরণের চলতে লাগল ভূতত্ত্বের আলোচনা। ওয়ালাসটন সংগ্রহ করলেন প্রত্যেক জিনিসটি, যা যেখানে পাওয়া গেল আর যা যেখানে জন্মাত। বুলক ম্যালোরী

মরশেড আর হাওয়ার্ড বারী চেষ্টা করতে লাগলেন নানান দিক দিয়ে সব চেয়ে উঁচু শৃংগে ওঠবার। কিন্তু যাই হোক সেপ্টেম্বর মাস না হলে আর শৃংগে ওঠবার পথ দেখা গেল না।

১৯ জুন অভিযান এল টিংরীতে। এখান থেকে এভারেস্ট মাত্র ৪৪ মাইল দূর। এদিকে বর্ষার বেগও কমে এসেছে, মহা উৎসাহে সবাই আরম্ভ করলে নিজের নিজের কাজ। ২৩ জুন ম্যালোরী আর বুলক ষোল জন বাছা বাছা কুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দল ছেড়ে। অজানা পথ—গাছ পালার চিহ্ন নেই, জনমানবের সাড়া নেই, চারদিকে ধূ ধূ করছে শুকনো পাহাড়ের পর পাহাড়। তবু কি আর বিরাম আছে? আশায় বুক বেঁধে ম্যালোরী চলেছেন এগিয়ে। ২৬ জুন তাঁরা এসে পৌঁছলেন রংবুক উপত্যকায়। এখান থেকে এভারেস্ট মাত্র ১৬ মাইল দূরে। আর কি—ম্যালোরীর মুখে হাসি বুকে আশা। ১৬,৫০০ ফুট উঁচুতে তাঁবু পড়ল।

অদ্ভুত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য রংবুক উপত্যকার। বরফের পর বরফের চূড়া উঠেছে পাশাপাশি—যেন বিশ্বকর্মার হাতে গড়া শ্বেতপাথরের দেব মন্দির। এ হেন সুন্দর জায়গায় চলা কিন্তু ভারি বিপদ। শরীরের সব শক্তি যেন কোথায় চলে

যায়, দেহে মনে নেমে আসে একটা ক্লান্তি। এগিয়ে চলতে চলতে ম্যালোরী কত পাহাড়ে উঠলেন, কত পাহাড়ে যে নামলেন—পথ আর খুঁজে পান না। উনিশ দিন ক্রমাগত চেষ্টার পর তিনি এসে পড়লেন একটা পাহাড়ের কাঁধে। সেখান থেকে তুষার জমি একেবারে নেমে গেছে ১৫০০ ফুট নিচে। খাড়াপাহাড়—ফিরতে হল। এখন বাকী শুধু উত্তর পূবের পথ। দলের অন্য লোকেরা করেছে কি, খার্টা বলে সবুজ লতা পাতায় ঘেরা একটা চমৎকার পাড়াগাঁয়ে তাঁবু ফেলে জরিপ মাটি পরীক্ষা আর নানান রকমের তথ্য সংগ্রহের কাজে মন দিয়েছে। এখানটা উচুঁ মাত্র ১২,৩০০ ফিট। খার্টায় ফিরে ম্যালোরী আর বুলক যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ফলফুলে ভরা পল্লীমায়ের কোলে।

আগস্ট মাস তখন পড়ে গেছে। খার্টা উপত্যকার কোল ধরে যেতে যেতে ম্যালোরী এসে পড়লেন কামা উপত্যকায়। এর একদিকে এভারেস্ট, আর একদিকে মাকালু। চমলন জো শিখরের বরফঢাকা চূড়াটিও ঝলমল করছে সূর্যকিরণে। আবার অরুণ নদীর উপত্যকা যেখানে এসে মিশেছে, সেখানে জুনিপার গাছের বিরাট বন। ম্যালোরী মুগ্ধ হলেন সে সৌন্দর্য দেখে। এভারেস্টের এত কাছে যে এমন চমৎকার বনানী-ঘেরা জায়গা থাকতে পারে

তা কেউ ভাবতেই পারে না। ম্যালোরীর মতে এমন সুন্দর উপত্যকা বোধ হয় হিমালয়ের আর কোথাও নেই।

এভারেস্ট মাত্র তুমাইলের পথ। ঐ তো দেখা যাচ্ছে পিরামিডের মত প্রধান চূড়াটি আর তার পাশেই প্রায় ৮০০ ফুট দূরে ছোট পিরামিডের মত আর একটি শিখর। প্রধান শৃংগটির চারিদিকে খাড়া বরফের পাঁচিল। এখানে ওঠা যে কি শক্ত। আবার বিপদের ভয়ও পদে পদে, চলতে হয় যেন প্রাণটি হাতে নিয়ে।

যাত্রা সুরু হল ২০ সেপ্টেম্বর। ম্যালোরীর দল চলেছে হিমনদী আর বরফের চাঁইএর ওপর দিয়ে। কষ্টের আর সীমা পরিসীমা নেই। যেতে যেতে প্রধান শৃংগটির উত্তর পশ্চিমে দেখা গেল একটা পথ—যেখানে এভারেস্টের কাঁধের ওপর বাসা করে রয়েছে একটা হিমনদী। এর ওপরেই তুষারে ভর্তি আর একটা গিরিপথ। এটিকে তাঁরা নাম দিলেন নর্থ পাস বা নর্থ কল। তুমাইল আর কমছে না, এই তুটি মাইল গেলেই প্রধান শৃংগটির কাছে যাওয়া যায়। তারপরে বাকি থাকবে মাত্র ৮২০ ফুট। কিন্তু এইটুকু বাকি রাখতে তাদের জীবনের আর কতটুকু বাকি ছিল জান? তখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, শাদা শাদা তুষারে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত ঝড় আর

কুয়াসায় চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিচ্ছে, সোঁ সোঁ করে কন্‌কনে হাওয়া বয়ে হাড়ের ভেতর যেন করাত চালিয়ে দিচ্ছে। এর ওপরে যেতে হচ্ছে বরফ কেটে পথ তৈরি করতে করতে। ব্যাপারটা কি বুঝছ তো ?

এক সংগে কোমরে দড়ি বেঁধে সবাই চলেছেন পাসের ধারে ধারে। ২৪ সেপ্টেম্বর ম্যালোরী পৌছলেন ২৩,০০০ ফুট উচুতে এভারেস্টের ঠিক নিচেই এক বিরাট বরফ স্তূপের ওপর। তাঁবু খাটানোর পক্ষে জায়গাটি নেহাৎ মন্দ নয়। ওপরেই একটু পশ্চিমে এভারেস্ট উঠেছে অর্ধচন্দ্রের মত বাঁকা হয়ে। তার চারদিকে উঠছে প্রবল ঝড় ঘূর্ণীর মত ঘুরে ঘুরে, সংগে উড়ছে ধব্‌ধবে শাদা তুষাদের কণা—যেন দেবলোক থেকে অনবরত হচ্ছে পরিজাত বৃষ্টি। তা বলে পারিজাতের মত সুখস্পর্শ তো নয়ই, বরং এলোপাথাড়ি ভূতের চড়ের মত প্রাণঘাতী। আর সে ঝড়ও তো আর যে সে ঝড় নয়, তার আওয়াজই যেন শত সহস্র কামান একসংগে গর্জন করছে।

ম্যালোরী মরশেড বুলক আর হুইলার চেষ্টা করলেন আরও এগিয়ে যেতে। কিন্তু যেই তারা পাসের ওপর দিকে যাচ্ছেন, অমনি তাঁদেরকে পেছন পানে ধাক্কা দিলে প্রলয় ঝঞ্ঝার মত প্রবল ঝড়। সেই শীতে আবার এই ঝড়।

......জায়গাটি নেহাৎ মন্দ নয়

এ সহ্য করা কি একটুখানি কথা? তাঁরা আর এগোতে পারলেন না, ঝড় থামবার প্রতীক্ষায় চারদিন রইলেন তাঁবুতে। তারপর ঝড় যদিও বা থামল, বরফ পড়ে এভারেস্টের চূড়া গেল একেবারে ঢেকে। এ অবস্থায় এগিয়ে যাওয়া মানেই আত্মহত্যা। বুদ্ধিমানের মত ম্যালোরী তাঁবু তুললেন।

কতদিন পরে জেলাপ পাস আবার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল অশ্বতরের খুরের আওয়াজে। ভ্রমনকারীরাও চললেন যে যার দেশে, আবার হিমালয়ে অভিযান করে শেষচূড়া পর্যন্ত ওঠবার আশা নিয়ে।

আরও কবার

সব অভিযানের কথাই বলতে হবে বুঝি ? তাহলে ছোট্ট করে বলি শোন।

মাস কয়েক বিশ্রাম নিতেই আরোহীদের অবসাদ গেল কেটে। তাই বছর শেষ হতে না হতেই নতুন উৎসাহে গড়ে উঠল দ্বিতীয় অভিযানের দল। এবার নেতা হলেন ব্রিগেডিয়া ব্রুশ। পাহাড়-পাগলা ম্যালোরী আর নর্টন তো আগেই এসে যোগ দিয়েছেন, আরও দুজন নামকরা পাহাড়-চড়া লোক এলেন এবার—সমারভেল আর ফিঞ্চ। ডাক্তার ওয়েকফিল্ড এলেন কানাডা থেকে। শেরপা ভুটিয়া কুলিদের মধ্যে তো হুলুস্থুল বেধে গেল, সবাই চায় যেতে। এবার কুলিদের দলে এল হরিণের মত চঞ্চল হাসিমুখো উৎসাহী এক ছেলেমানুষ,—নাম তার লাপকাশেরিং।

১৯২২ এর পয়লা মার্চ, দলবল নিয়ে ব্রিগেডিয়া ব্রুশ এলেন দার্জিলিঙে। যোগাড় যন্তর ঠিক করতে কাটল পঁচিশ দিন। ২৬ মার্চ অভিযান সুরু হল সিকিমের পথে। সেই পুরোনো পথে হাসিহল্লার লহর তুলে নতুন উৎসাহে চলেছে অভিযাত্রীর দল। ৮ই এপ্রিল টাংগালা পার হয়ে ২৪ এল শেখরে, তারপর রংবুকে। এবার তাঁবু ফেলবার

পালা। প্রথম তাঁবু পড়ল ১৭,০০০ ফুট উঁচুতে। তারপর ২০০০ ফুট অন্তর অন্তর পড়ল আরও দুটো তাঁবু। তৃতীয় তাঁবু পড়ল ২১,০০০ ফুট উঁচুতে—প্রায় হিমচূড়ার কোল ঘেঁসে।

ম্যালোরীর দল এগিয়ে চলেছে প্রথম অভিযানের সীমা ছাড়িয়ে। ২০ মে সাড়ে সাতটায় আরম্ভ করে সাড়ে এগারোটায় তাঁরা উঠলেন ২৫,০০০ ফিট উঁচুতে। ম্যালোরী তো বেজায় খুশি, কিন্তু সবাইকার শরীরের যা অবস্থা। পা আর ফেলা যায় না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, অবসন্ন রোগীর মত অবস্থা হয়ে উঠল সকলের। একেই তো এবারের শীত আগের বারের চাইতে বেশি, তার ওপরে চারদিকে মেঘ, দেখাও যায় না কিছু। কি আর করেন, পঞ্চম তাঁবু গেড়ে রাত্রির মত সবাই বিশ্রাম নিলেন সেখানে।

২১ মে সকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে তুষারপাত। কিছু খেয়ে নিয়ে জামাজুতো পরে বেরুলেন ম্যালোরী নর্টন সমারভেল আর মরশেড। কোমড়ে দড়ি বেঁধে চারজনে চলেছেন, কিন্তু চলতে কি আর পারছেন? বেলা আড়াই-টার সময় তাঁরা উঠলেন ২৬,৯৮৫ ফিট উঁচুতে। পা আর এগোয় না, শক্তিতেও আর কুলোয় না, কাজেই এবার ফেরার

পালা। ফিরছেন—হঠাৎ টান পড়ল ম্যালোরীর কোমরের দড়িতে। কি না—কি ? তৃতীয় লোকটি গেছেন পা পিছলে পড়ে। চট্ করে ম্যালোরী হাতের কুড়ুল বরফের মধ্যে পুঁতে দিয়ে কোমরের দড়িটা দিলেন তাতে জড়িয়ে। এমনি করে রক্ষা পেল সবাই, নইলে কি হত বুঝেছ তো ? রাতের আঁধার নেমে এল হিমালয়ের বুকে। কতবার পথ ভুলতে ভুলতে মড়ার মত হয়ে চারটি লোক ফিরলেন তাঁবুতে।

২৪ মে। বারোজন কুলি, একজন গুর্খা আর অনেক করে অক্সিজেন নিয়ে ব্রুশ আর ফিঞ্চ উঠলেন ২৭,০০০ ফুট, এমন সময়ে অক্সিজেন যন্ত্রটা গেল ভেঙে। ভাঙা যন্ত্র জুড়ে-তেড়ে নিয়ে কোন রকমে আরও ২৩৫ ফুট এগোলেন বটে—কিন্তু আর তো পারা যায় না। প্রধান তাঁবুতে ফিরলেন তাঁরা।

৫ই জুন, আবার চলেছে ম্যালোরীর দল। সংগে চারজন কুলি আর তিনজন ইংরেজ। চলেছেন তো চলেছেন প্রাণ পণ করে। হঠাৎ হাজার বাজ গর্জে উঠল, চোখের সামনে বরফের চাঁই ভাঙতে লাগল কুঁকড়ে তুমড়ে, পায়ের তলার বরফ সাঁ সাঁ করে ছুটে চলল নিচের দিকে।

সর্বনাশ, নিমেষে যায় বুঝি সব শেষ হয়ে। কোমরের দড়িতে হ্যাঁচকা টান, কুলিরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে

কে জানে ? আর ম্যালোরী ? এ বিপদেও ম্যালোরী কিন্তু বুদ্ধিহারা হন নি। চলন্ত বরফের ওপর শুয়ে পড়ে ম্যালোরী হাত পা ছুড়তে লাগলেন চিৎসাঁতারের ভংগিতে। কিছু পরে মনে হল যেন বরফের বেগ কমেছে। ম্যালোরী উঠে দাঁড়ালেন, সমারভেল আর ক্রাফোর্ডও উঠলেন। কিন্তু কুলিরা কোথায় ? দেখতে দেখতে দেখা গেল প্রায় ১৫০ ফিট নিচে একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চার জন। আর দুজনকে পাওয়া গেল বরফে পোঁতা অবস্থায়। তারা বাঁচল বটে, কিন্তু আর সাতজন চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে রইল বরফের নিচে।

ক্ষুণ্ণ মনে ম্যালোরী ফিরলেন প্রধান তাঁবুতে।

এমনি করে শেষ হল দ্বিতীয় অভিযান।

তৃতীয় অভিযানের দল গড়ে উঠল ১৯২৪ খৃস্টাব্দে। এবার নর্টন হলেন পাণ্ডা। ম্যালোরী তো এসেছেনই, তাঁর সংগে এসেছেন আরভিন। এবার সাজপোশাকের একটু রকম-ফের। সংগে নেয়া হল কানচাপা টুপি, তুষার আটকানো চশমা, হাওয়া আটকানো জামা এই সব। শীতটাও অন্যবারের চেয়ে বেশি।

২৯শে এপ্রিল অভিযান এল বেস ক্যাম্পে। মে মাসের প্রথম থেকেই আরম্ভ হল বরফ পড়া। ৬ই মে বরফ পড়ল খুব বেশি, ফলে অনেকেরই হল খুব অসুখ। অনেককে ফেরত

পাঠানো হল নিচে। তখন সবে ২১,০০০ ফুট উচুঁতে। হলে কি হবে? দিন দিন তুষার পাত বেড়েই চলল। সংগে রইল মাত্র সতেরো জন লোক। এই দুর্জয় শীতে আর অবিশ্রান্ত তুষারপাতের মধ্যে কুলিরা আর এক পাও এগোবে না। তাই ১৫ই মে সবাইকে ফিরতে হল চার মাইল নিচে এক মঠে। সেখানে বেশ করে খেয়ে দেয়ে আর লামার আশীর্বাদ নিয়ে নতুন উৎসাহে সবাই উঠল আবার বরফপুরীতে। প্রথমে নর্টন আর ম্যালোরী চললেন বরফ কেটে রাস্তা তৈরি করে। ফিরতি-মুখে নর্টন গেলেন পড়ে, আর ম্যালোরীও এক ফাঁপা বরফে পা দিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন বরফের ওপর কুড়ুল গেঁথে।

মে মাস শেষ হয়ে আসছে। ম্যালোরী এবার মরিয়া—হিমালয় জয় করা তাঁর চাইই। পনর জন বাছা বাছা লোক নিয়ে তৈরি হল বাঘের দল। নয়টি বাঘ আর ক্রুশকে সংগে নিয়ে ম্যালোরী বেরলেন ২রা জুন। কিন্তু সেই পাহাড়ে ঝড়। ২৫,০০০ ফুট উঠে আর কেউ এগোতে পারলেন না এক পাও। ম্যালোরীকে ফিরতে হল চারনম্বর তাঁবুতে।

দুদিন পরে নর্টন আর সমারভেল বেরলেন প্রাণপণ করে। ২৭,০০০ ফিটের কাছে এসে নর্টনের ভীষণ কাঁপুনি আরম্ভ

হল। ছ সাতটা জামা গায়ে দিয়েও থামতে চায় না সে কাঁপুনি। তার ওপরে চোখের এমন দোষ হল, যে তিনি প্রত্যেকটা জিনিস দেখতে লাগলেন ছু ছুটো করে। সমারভেলের গেল গলা বসে। তবু ছুজনে অতি কষ্টে উঠলেন ২৮,১২৬ ফিট—মানে কাঞ্চনজংঘার সমান আর কি।

এই উঁচু থেকে পৃথিবীর যে দৃশ্য দেখেছেন সমারভেল তা কথায় বলা যায় না।

এবার ম্যালোরী আর আরভিন। ৭ই জুন সকালবেলা ছুজনে ছ নম্বর তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলেন চারজন কুলি সংগে নিয়ে। তারপরে কুলিরাও আর রইল না সংগে। চিঠি লিখে তাদের পাঠানো হল নিচের তাঁবুতে। ছুটি বন্ধুতে চলেছেন বীরগর্বে হিমালয়ের গর্ব চুরমার করে দিতে। দূরবীণ নিয়ে ভূ-তত্ত্ববিদ্ ওডেল বসে আছেন তাঁবুতে তাদের দিকে নজর রেখে।

সাড়েবারোটার সময় ওডেল দেখলেন খুব উঁচুতে ম্যালোরী আর আরভিন চলেছেন বরফের উপর দিয়ে। দেখতে দেখতে একখানা নিরেট মেঘ এসে তাদেরকে লুকিয়ে ফেললে। খানিক পরে একটা দমকা হাওয়ায় ম্যালোরী আর আরভিনের সামনের মেঘ গেল অনেক দূরে সরে। ছুবন্ধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে—যেখানে

এভারেস্ট তার আশ্চর্য গরিমাময় রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের বুকে মাথা ঠেকিয়ে। ওডেল দেখছেন এভারেস্টের চূড়ার প্রায় কাছাকাছি দুটি বিন্দুর মত চলেছে দুই বীরপুরুষ, তার সব গর্ব দূর করতে। ঠিক এই সময় হাতীর মত একখানা মেঘ এসে দিলে তাদেরকে একেবারে ঢেকে।

ওডেল আর তাঁবুর সবাই বসে রইলেন তাঁদের পথ চেয়ে। রাত হয়ে গেছে, চারদিক ঘুরঘুট্টি অঁাধার, কাছের জিনিসই দেখা যায় না—তা আবার দূরের। তার ওপরে ভীষণ ঝড়ের সংগে সংগে তুষার উড়তে আরম্ভ করলে। বরফের চাপ ভেঙে পড়ার ভীষণ আওয়াজে কানে তো তালা লাগবার যোগাড়। সারাটা রাত কেটে গেল এই ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যে। সকাল হল—ম্যালোরী আর আরভিনের দেখা নেই। সবচেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওডেল। কতখানি এগিয়ে গিয়ে কত চীৎকার করলেন কত শিস্ দিলেন তিনি, কিন্তু ম্যালোরী আর আরভিনের পাত্তা মিলল না।

ওডেল আর কি করেন, দুটো ঘুমোবার ব্যাগ জুড়ে ইংরেজি টি চিহ্ন করে তাঁবুর লোকদের জানিয়ে দিলেন তাঁদের নিরুদ্দেশের খবরটা। তারপর ম্যালোরীর কম্পাস আর আরভিনের অক্সিজেন যন্ত্র নিয়ে ওডেল ফিরলেন নিচের তাঁবুতে।

অভিযানও ফিরল।

এবার ম্যালোরী আর আরভিনকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২৮,০০০ ফিট উঁচুতে। তাঁরা আর কতখানি উঠেছিলেন তা কে বলবে ?

এরপর নয়বছর একেবারে চুপচাপ।

১৯৩৩ খৃস্টাব্দে চারবারের বারন তুন দল গড়ে উঠল। নেতা হলেন হিউরাটলেজ। ইনি ছিলেন আই, সি, এস্— মানে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। এবার কমেত বিজয়ী স্মাইদ এলেন এই দলে। মার্চ মাসে অভিযান সুরু হল। ২৭,৪০০ ফুট উঁচুতে পড়ল ছ নম্বরের তাঁবু। দলের তিন জন উঠলেন প্রায় ২৮,১০০ ফুট উঁচুতে। কিন্তু হলে কি হবে, মে মাসের শেষে হঠাৎ বর্ষা নামল ভীষণ। অভিযান ফিরল।

এদিকে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে কি হল জান ? বারবার পায়ে হেঁটে হিমালয় জয় করা যাচ্ছে না দেখে কয়েকজন উৎসাহী লোক কল্পনা জল্পনা করতে লাগলেন আকাশপথে একে জয় করবার। কিন্তু ব্যাপারটি তো বড় সোজা নয়। এতে টাকা খরচ হবে ঢের, আর এরোপ্লেনে উঠতে হবে প্রাণের মায়াটি একেবারে ছেড়ে। সাহসী লোক যদি বা পাওয়া যায়, টাকা পাওয়া যাবে কোথায় ? এতখানি

ইচ্ছে যখন রয়েছে, উপায়ও তখন একটা না একটা হবেই। হলও তাই। লেডি হাউসটন ছিলেন খুব ধনী ইংরেজ মহিলা। ইনিই রাজি হলেন সমস্ত খরচ-খরচা দিতে। আর কি, যোগাড় যন্তর দলবল সব ঠিকঠাক। দলের নাম হল হাউসটন অভিযান। আর কর্তা হলেন ক্লাইড-সডেল।

৩রা এপ্রিল দুখানা এরোপ্লেনে চারজন লোক পূর্ণিয়ার লালবালু এরোড্রোম ছাড়লেন সওয়া-আটটায়।

এরোপ্লেন উড়ে চলেছে। এবার আভিযাত্রীদের মুখে হাসি। একশ ফিট ওপর দিয়ে এরোপ্লেন দুখানা দুবার এভারেস্টকে চক্কর দিলে। আর এভারেস্টের লুকোন রূপটুকু ক্যামেরায় ধরে এনে তার গুমর দিলে ভেঙে।

একটা রেকর্ড করলে ক্লাইভসডেলের দল।

১৯৩৬ খৃস্টাব্দে তৈরি হল পঞ্চম অভিযানের দল। এবারেও নেতা রাটলেজ। ৮ই মার্চ যাত্রা সুরু। এবার-কার প্রধান আরোহী হলেন স্মাইদ আর শিপটন। ২৩,০০০ ফুট উঁচুতে তাঁরা চতুর্থ তাঁবু বসালেন ১৪ই মে। তারপরেই আরম্ভ হল তুষার ঝড়। সে যে কি ঝড়, যেন এভারেস্টকে সবশুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সাগর জলে। মাথার ওপর চলেছে অবিশ্রান্ত তুষার বৃষ্টি, আর পায়ের নিচে বরফ

জমি চড়্‌চড়্‌ শব্দে চৌচির হয়ে ছুটে চলেছে কোন্ অতল তলে। বরফে বরফে চারদিকের পথ গেছে বন্ধ হয়ে। উইনহ্যারিস আর শিপটন পথ পরীক্ষা করতে গিয়ে বিফল হলেন। ১৫ই জুন স্মাইদ আর উইনহ্যারিস আবার চললেন নতুন পথের সন্ধানে। কিন্তু পথ কোথায় ?

রাটলেজের হুকুমে ১৫ই জুন অভিযান হল ফিরতি-মুখো।

কিন্তু সত্যিকারের মানুষ যাঁরা প্রকৃতির কাছে হার মানা কি তাঁদের কুষ্ঠিতে লেখে ? বল না তুমিই। তাই আবার নতুন দল যাত্রা করলে ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে।

এবারকার কর্তা কে জান ? কর্তা হলেন এইচ, ডবলিউ টিলম্যান। কিন্তু এবার বর্ষা নেমেছে ঢের আগেই, তাই অভিযানকেও ফিরতে হল অল্প একটু এগিয়েই। অভিযাত্রী-দের দেহ ফিরল বটে, কিন্তু মন কি তাদের ফিরেছে ? এত চেষ্টায় বিফল হয়ে কি মানুষ পড়বে পিছিয়ে ? তাদের এখনও আশা সুযোগ পেলেই উঠবে তারা হিমালয়ের শেষ চূড়ায়—সেখানে ওড়াবে তাদের বিজয়পতাকা।

তাই যদি না হল তবে মানুষের চেষ্টার দাম কি বল ?

সত্যিই তো তোমার এই শেষের প্রশ্নটাই হচ্ছে গোড়ার কথা। এই দুর্ধর্ষ হিমালয়—তার জন্মের কথাটা না জানলে তো আসলেই থেকে গেল ফাঁক।

হাজার হাজার বছর আগে হিমালয় কোথায় ছিল জান? হিমালয় ছিল সাগরের তলায়। অবাক হয়ে যাচ্ছ যে? হলে কি হবে, ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি।

সমুদ্রের নিচে মরা বড় বড় মাছ আর বড় বড় জলজন্তুর বিশাল দেহগুলো ছিল জড়ো হয়ে। তার সংগে যোগ দিল শামুক গুগলির শক্ত খোসাগুলো। বছরের পর বছর ধরে কাদা আর বালুস্তরে ঐগুলো গেল ঢাকা। তার ওপরে জমল আবার নতুন নতুন বালু আর কাদা। এই নতুন কাদাবালির চাপে পুরোনো কাদাবালি হয়ে উঠল শক্ত। তারপর ওপরের নতুন নতুন কাদামাটির চাপে নিচের মাটি শক্ত হতে হতে স্তরের পর স্তর হয়ে উঠল শক্ত পাষাণ। তারপর হয়তো একদিন ঘটল একটা বড়সড় ভূমিকম্প, বা এমনি একটা কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আর নিচের বিরাট পাষাণ পেল সমুদ্রের কবল থেকে মুক্তি। তখনও ওর মাথায় আছে কাদামাটির বোঝা। অনেককাল ধরে বর্ষার জলে ধুয়ে,

ধুয়ে পাষাণ বেরিয়ে পড়ল পাষাণ হয়ে। এমনি করে অজেয় হিমালয়ও দেখা দিল পৃথিবীর বুকে। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? কিন্তু উপায় তো নেই, বিশ্বাস করতেই হবে। হিমালয়ের গায়ে অনেক উঁচুতে পাওয়া যাচ্ছে ঐ সব জল-জন্তুর গায়ের ছাপ, আর পাথর হয়ে যাওয়া তাদের দেহ-গুলো। ঐগুলোকে ইংরেজীতে বলে ফসিল। ঐ ফসিল-গুলি পরখ করতেই মানুষের চোখে ধরা পড়ল পৃথিবীর আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির রূপটা। মানুষ সৃষ্টিরও আগে পৃথিবীটা কেমন ছিল তাও তারা নিল জেনে।

এখন বুঝলে তো কত ছোট জিনিস থেকে হয়েছে হিমালয়ের মত বিরাট বিশাল একটা পর্বত? এমনি ধারা তোমার আর তোমার ছোট বন্ধুদের ছোট্ট ছোট্ট হাতগুলি আর কচি কচি বুক দিয়ে হতে পারে কত বিরাট মহৎ কাজ। ছোটরাই তো আর সত্যিকারের ছোট নয়—বড়দের সৃষ্টি হয় ছোটদেরই ভেতর দিয়ে। কাজেই সত্যিকারের বড় হতে হবে তোমাদেরও, বুঝলে?

অনেকদিন কেটে গেল দার্জিলিঙের বুকে। খবরও তোমার জানতে কিছু বাকি রইল নাকি? থাকে তো থাক এবার ছুটিও এল ফুরিয়ে—চিঠিও হল শেষ। তোমায় আমায় দেখা হবে কবে বলতো? প্রীতি নিও।